নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশ্চিমরাঢ়ের আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে
পিএইচ.ডি (আর্টস) উপাধিপ্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভের
সংক্ষিপ্তসার

গবেষক
বিন্দেশ্বর টুডু
নিবন্ধভুক্তি সংখ্যা: A00BE1301016
বর্ষ: ২০১৬-২০১৭

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক গোপা দত্ত
বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা– ৭০০০৩২
২০২৩

ভূমিকা

রাঢ় এক অতি প্রাচীন দেশ, সভ্যতার আদিভূমি। রাঢ় অঞ্চল বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। রাঢ় অঞ্চলের বিশাল আয়তন, উত্তরে বীরভূমের ময়ূরাক্ষী সীমা, দক্ষিণে পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম, পূর্বে পশ্চিম বর্ধমান ও হুগলীর আরামবাগ থেকে পশ্চিমে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বৃহৎ রাঢ় অঞ্চলকে দুই ভাগে চিহ্নিত করা যায়- ১. পূর্বরাঢ় ২. পশ্চিমরাঢ়। আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম হল- 'নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশ্চিমরাঢ়ের আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি'। পশ্চিমরাঢ় হল রাঢ়ের পশ্চিমাংশ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলা। পশ্চিমরাঢ় নানা জাতি, উপজাতি এবং তথাকথিত নিম্নবর্ণীয়দের সংখ্যা বেশি। সাঁওতাল, কোল, কোড়া, বিরহড়, মাহালি, মুণ্ডা, শবর, ভূমিজ, কর্মকার, বাউরি, বাগদি, হাড়ি, ডোম, মুচি, শুঁড়ি, করগা ও খয়রা প্রভৃতি তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিরা বসবাস করে। এরা প্রকৃতিগতভাবে স্বভাব-সরল, অনাবিল, অকপট, সৎ ও পরিশ্রমী হয়। এখানকার আদিবাসীদের সংস্কৃতিতেও নানারকম বৈচিত্র্য দেখা যায়। পশ্চিমরাঢ়ের ভূ-প্রকৃতি আবহ পরিবেশের মতো নানারকম বৈচিত্র্য রয়েছে। কৃপণ প্রকৃতির দাক্ষিণ্যবর্জিত পশ্চিম প্রান্তিক রাঢ়ভূমির বহিরাবরণ রুক্ষ, অনুর্বর ও কঙ্করময়। জীবনযাপনের জন্য তাদেরকে সারাজীবন ধরে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। তবুও মানুষগুলির হৃদয় সরসতায় পূর্ণ থাকে। শত দুঃখ কষ্টেও তারা উৎসবে নৃত্য মেতে ওঠে। তাদের আবেগ-উল্লাসের স্বতঃস্ফূর্ততায় শ্রুতি-সুখকর সুর-মূর্ছনায় আকাশ-বাতাসকে মাতিয়ে তোলে। বনজঙ্গল, ডুংরি-দাড়াং, ছোটো ছোটো পর্ণ কুটিরে কিংবা শিলাবতী-কংসাবতী-কুমারী-দ্বারকেশ্বর-দুয়ারসিনীর কিনারে কিনারে অসংখ্য মানুষের আবাসমূলে কান পাতলেই লোকসংগীতের মনমাতানো সুর শোনা যায়। এছাড়াও বিভিন্নরকম পালা-পার্বণে, উৎসব অনুষ্ঠানে ধাঁধা-প্রবাদ-উপকথা প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির বহুবিচিত্র ধারা-উপধারা শোনা যায়। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের সীমানা যেমন বদলেছে তেমনি এই অঞ্চলের মানুষেরা বংশ পরম্পরায় বৃহত্তর জনসমাজ থেকে নানা কারণে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, কিংবা দীর্ঘকাল ধরে তারা বহু ভাবে শোষণ, অত্যাচার ও অবহেলা মুখ বুজে সহ্য করেছে। এমনকি স্বাধীন দেশে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের উপযুক্ত ব্যবস্থা টুকুও তারা পায় না। পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের এই সব মানুষরা আদিম জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত। ভারতীয় ইতিহাসে এদেরকে আদিবাসী বলা হয়। এদের জীবনযাত্রার

নানা ক্ষেত্র রয়েছে, রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠানের আঙিনাতে, ধর্ম বিশ্বাস ও জীবন সংস্কৃতিতে এক ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সূচিত করে। বাংলা সাহিত্যের আদিকাল থেকে আদিবাসী সমাজ জীবনের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। চর্যাকাররা সমাজের বিভিন্ন জাতির জীবনকে তুলে ধরে তাদের সধনার গূঢ়ার্থ সম্পর্কে বোঝাতে চেয়েছিলেন। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের পর উনিশ শতকে নবজাগরণের সময় আদিবাসীদের পরিচয় পাওয়া না গেলেও, কিছু জায়গায় তাদের আংশিক পরিচয় মেলে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে বাঙালি জাতির উৎপত্তির কথা বলতে, আদিবাসী প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বীরভূমের শান্তিনিকেতনে দীর্ঘকাল আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় বসবাস করার ফলে আদিবাসীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে সাহিত্যের বিষয় করেননি। তিনি আদিবাসী অঞ্চলকে পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। ১৯২৩ সালে *কল্লোল* পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে একদল তরুণ লেখকগোষ্ঠী সমকালীন সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যে রচনার বিপরীত পথে হাঁটতে শুরু করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবমুক্ত হওয়া কল্লোলীয়ানদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকরা সমাজের প্রান্তবর্গীয় মানুষদের নিয়ে বাংলা সাহিত্যে এক নব দিগন্তের উন্মোচন করে। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকরা প্রথম সাহিত্যে এই উপেক্ষিত মানুষের দিকে চোখ মেলে দাঁড়ালেন। তাদের অস্তিত্বের সংকট কাহিনির বয়ানে ব্যক্ত করতে চাইলেন। সাহিত্যে এই সব ব্রাত্য চরিত্রগুলিকে বাস্তব পটভূমিতে যথাযোগ্য ও নায়কোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকরা সমাজের বুকে প্রান্তবর্গীয় মানুষদের অধিকার রক্ষা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। যা সমকালীন সাহিত্যে আন্দোলনের ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ।

ভারতবর্ষে প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে আগস্ট আন্দোলন (১৯৪২), পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩), হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা(১৯৪৭), আজাদ-হিন্দ আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭) ঘটনা ঘটেছিল। এরপর দেশবাসীকে এক এক করে দেশভাগ, স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও উদ্বাস্তু সমস্যায় সম্মুখীন হয়েছিল। ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই ভারতের অর্থনৈতিক সংকট, শ্রেণি সংগ্রাম, রাজনৈতিক টানাপোড়েন, ভূমি বন্টন ব্যবস্থা অর্থনৈতিক বৈষম্য ভারতবর্ষের মানুষকে ধীরে ধীরে নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্তে আলাদা করে দেয়। বৃহত্তর শ্রেণির মানুষ সত্তা খুইয়ে নিম্নবিত্তে পরিণত হয়। সাহিত্যিকরা এইসব সর্বহারা, নিঃস্ব, নিরন্ন অসহায় আদিবাসী মানুষগুলির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বাস্তব ছবিকে গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। ভারতের আর্থ-সামাজিক প্রভাবে ক্লিষ্ট দরিদ্র মানুষগুলির জীবন ইতিহাসকে এড়িয়ে কোন সাহিত্যিকের পক্ষে সাহিত্যে সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না। তাই সমকালীন পরিস্থিতিতে লেখকরা তাদের মুখের ভাষাকে সাহিত্যে রূপ দিয়েছিল। সাধারণত

দেশের দারিদ্র, বিত্তহীন জনগোষ্ঠী, সামাজিক অন্যায়ের চিত্র ও বিশ্লেষণ তাঁদের রচনায় ওঠে এসেছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিস্তৃত ভূখন্ডে পশ্চিমরাঢ়ের নিজস্বতায় লোকায়ত সমাজ ও মানুষের এক অন্তর্লীন পরিচয়ের হদিস পাওয়া যায়। তাদের প্রাত্যহিকতায় ছড়া, গান, লোককথা, ধাঁধা, প্রবাদ– প্রবচন, আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা লোকায়ত সংস্কৃতিতে এক নতুন দিশার নির্দেশক। পশ্চিমরাঢ়ের প্রতিটি অঞ্চলে দারিদ্র সীমার নীচে বাস করা অভাবী মানব গোষ্ঠীরা পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মানুষগুলির অবয়ব, বিশ্বাস, বৃত্তি, জীবনচর্যা, ভাষা ও সংস্কৃতি সবই পৃথক। কেবলমাত্র মানব সমাজে বেঁচে থাকার জন্য দৈনন্দিন জীবনে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা একরকম ছিল। সেই সব দরিদ্র অসহায় মানুষগুলির দৈনন্দিন জীবনের চাহিদাগুলি পূরণের জন্য নিজেদের কায়িক শ্রমের উপর নির্ভর করতে হয়। প্রগতিশীল সমাজের সঙ্গে এই অঞ্চলের মানুষদের যোগাযোগ ছিল না। তৎকালীন প্রশাসনও তাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসেননি। এইসব কারণে পশ্চিমরাঢ়ের মানুষদের নানান অসংগতি ও অপ্রাপ্তি রয়ে গেছে।

কয়েকজন বাংলা কথাসাহিত্যিকরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী প্রভাব, স্বাধীনতা লাভ, দেশ বিভাজন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সর্বোপরি মানুষের আত্মিক মূল্যবোধের নিদারুণ অবক্ষয়, অবদমন, সুস্থ মানবিক পরিবেশের বিকৃত নগ্ন রূপকে দেখেছেন এবং অসহায়, অজ্ঞ, নিরক্ষর ও বোকা মানুষদের প্রতিনিধি হয়ে পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলকে কেন্দ্র করে কলম ধরেছিলেন। আমার গবেষণা কর্মে নির্বাচিত কয়েকজন গল্পকাররা হলেন- শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়(১৯০১-১৯৭৬), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), মহাশ্বেতা দেবী(১৯২৬-২০১৬), ভগীরথ মিশ্র (১৯৪৭), নলিনী বেরা (১৯৫২)। এঁদের মধ্যে প্রথম চারজন স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালে জন্মেছেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর নলিনী বেরা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। মহাশ্বেতা দেবী, ভগীরথ মিশ্র ও নলিনী বেরা সাহিত্যিকরা সত্তর দশকের সাহিত্য রচনায় মগ্ন ছিলেন। যা বাংলা কথাসাহিত্যে সৃজনে এক নতুন গতি সঞ্চার করেছিল। সমকালীন পশ্চিমবাংলার বামপন্থী আন্দোলন ও সত্তর দশকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রভাব এঁদের রচনায় লক্ষ করা যায়। একজন আদর্শ সাহিত্যসেবকের মতোই তারা নিরলসভাবে সাহিত্যে চর্চায় গ্রামের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। উল্লেখিত সাহিত্যিকরা এক নতুন জীবনবোধ নিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যের ভুবনকে যেমন বিস্তৃত পরিসরে নিয়ে গেছেন তেমনি এনেছেন আখ্যানের নতুনত্ব। এখানেই তাদের অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব। তাই

ষাট পূর্ববর্তী দশকগুলির গল্প ও উপন্যাস থেকে এঁদের সাহিত্যচর্চায় বিষয় ভাবনা নিঃসন্দেহে স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে।

'নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশ্চিমরাঢ়ের আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি' শীর্ষক আমার গবেষণা কর্মটি ভূমিকা ও উপসংহার বাদে আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়: রাঢ়ের ভৌগোলিক সীমা ও আদিবাসী সাঁওতাল, শবর, খেড়িয়া, লোধা ও মুণ্ডা জনজাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের রূপরেখা এবং বাংলা ছোটগল্পে তাদের অবস্থান। দ্বিতীয় অধ্যায়: শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি। তৃতীয় অধ্যায়: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজাতির আখ্যান বাস্তবতা ও বিশ্লেষণ। চতুর্থ অধ্যায়: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি। পঞ্চম অধ্যায়: মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি। ষষ্ঠ অধ্যায়: ভগীরথ মিশ্রের নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি। সপ্তম অধ্যায়: নলিনী বেরার নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি। অষ্টম অধ্যায়: পশ্চিম রাঢ়ের কয়েকজন আদিবাসী সাহিত্যিক।

আলোচিত অধ্যায়গুলিতে পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের স্থানিক অবস্থান, ইতিহাস, সংস্কৃতি, দৈনন্দিন জীবনকথা, অর্থনৈতিক অবস্থান, শ্রেণিগত বৈষম্য, লৌকিক উপাদান (লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, লোকবিশ্বাস ও সংস্কার ইত্যাদি) বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও লেখকের নিজস্ব ভাষা শৈলীর সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষা ও উপভাষার পরিচয় এবং কয়েকজন আদিবাসী সাহিত্যিকদের সাক্ষাৎকার (গোমস্তা প্রসাদ কিস্কু, কলেন্দ্রনাথ মান্ডি, মহাদেব হাঁসদা ও সারদা প্রসাদ কিস্কু) এ তাদের নিজস্ব মতামতকে তুলে ধরা হয়েছে। পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের ইতিহাস, সীমানা, ভাষা, গল্প রচনার সমকালীন প্রেক্ষিত, বাস্তবতা, সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় জানা যায়। পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের মানুষদের সমাজজীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ আমার এই গবেষণায় উঠে আসবে এই বিনম্র আশা রাখি।

পদ্ধতিবিজ্ঞান

এই অভিসন্দর্ভটিকে রূপ দিতে ভূমিকা, মূল আলোচনা, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি এই কয়েকটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ছোটগল্প সংগ্রহ করা হয়েছে যা এই অভিসন্দর্ভে আকর গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে বিভিন্ন সমালোচনামূলক গ্রন্থের পাশাপাশি পত্র-পত্রিকা এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আলোচনার ক্ষেত্রে মূলত বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি (Descriptive Research Method) ও ব্যাখ্যামূলক গবেষণা পদ্ধতি (Explanatory Research Method) অবলম্বন করা হয়েছে। বিশেষ ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতিও (Comparative Method) অনুসরণ করা হয়েছে। কালপুরুষ ১৪ ফ্রন্টে অভিসন্দর্ভটি মুদ্রিত হয়েছে, উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে ১২ ফ্রন্ট ও ইনডেন্ট রাখা হয়েছে, তাই কোটেশন চিহ্ন ব্যবহার করা হয়নি। অভিসন্দর্ভ রচনায় উদ্ধৃতি ছাড়া সমস্ত ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির *আকাদেমি বানান অভিধান* নির্দেশিত বানানবিধি অনুসরণ করা হয়েছে। MLA হ্যাণ্ডবুক এর পদ্ধতি মেনে গ্রন্থপঞ্জি তৈরি করা হয়েছে।

প্রাক্ গবেষণায় বাংলা ছোটগল্পে রাঢ় অঞ্চলের আদিবাসী জনজাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

আমার গবেষণার শিরোনাম হল 'নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশ্চিমরাঢ়ের আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি'। আমার এই গবেষণার অভিসন্দর্ভ রচনা করার পূর্বে বেশ কয়েকটি গবেষণা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে, যা গবেষণার পূর্বসমীক্ষা রূপে চিহ্নিত করেছি। নিম্নে সেই সমস্ত গবেষণাপত্রের শিরোনাম উল্লেখ করা হল- বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে অধ্যাপক ড. সুরোজ কুমার পান মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে অমর আদিকারী 'বাংলা ছোটগল্পে রাঢ়ভূমির সমাজজীবন(১৯৫০-২০০০): নির্বাচিত গল্পকার' নামক শীর্ষক গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ করেছেন। কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে অধ্যাপক ড. মোনালিসা দাস মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে শিখা হালদার 'নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যের পটভূমিতে রাঢ় অঞ্চলের কয়লা-খনির জীবন' নামক শীর্ষক গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ করেছেন। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে অধ্যাপক ড. উত্তমকুমার বিশ্বাস মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে বৈশাখী কুণ্ডু 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী জীবন-সমাজ-সংস্কৃতি(১৯৪৭-২০০০)' নামক শীর্ষক গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ করেছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে অধ্যাপক ড. সুদিত কৃষ্ণ কুমার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে শ্রী প্রদীপ কুমার দাস 'দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের সাঁওতাল সমাজ(১৯৭৪-২০০১)' নামক শীর্ষক গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ করেছেন।

গবেষণাপত্রের শিরোনাম ও অধ্যায় ভাবনা

শিরোনাম:

নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশ্চিমরাঢ়ের আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি

প্রাক্ গবেষণায় বাংলা ছোটগল্পে রাঢ় অঞ্চলের আদিবাসী জনজাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

পদ্ধতিবিজ্ঞান

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়:

রাঢ়ের ভৌগোলিক সীমা ও আদিবাসী সাঁওতাল, শবর, খেড়িয়া, লোধা ও মুণ্ডা জনজাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের রূপরেখা এবং বাংলা ছোটগল্পে তাদের অবস্থান

দ্বিতীয় অধ্যায়:

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি

তৃতীয় অধ্যায়:

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজাতির আখ্যান বাস্তবতা ও বিশ্লেষণ

চতুর্থ অধ্যায়:

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি

পঞ্চম অধ্যায়:

মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি

ষষ্ঠ অধ্যায়:

ভগীরথ মিশ্রের নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি

সপ্তম অধ্যায়:

নলিনী বেরার নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি

অষ্টম অধ্যায়:

পশ্চিম রাঢ়ের কয়েকজন আদিবাসী সাহিত্যিক

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

আমার গবেষণাপত্রের অধ্যায় বিভাজনগুলি নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হল-

প্রথম অধ্যায়:

রাঢ়ের ভৌগোলিক সীমা ও আদিবাসী সাঁওতাল, শবর, খেড়িয়া, লোধা ও মুণ্ডা জনজাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের রূপরেখা এবং বাংলা ছোটগল্পে তাদের অবস্থান

রাঢ় একটি প্রাচীন শব্দ। অতি প্রাচীন কাল থেকে 'রাঢ়' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অর্থের দিক থেকে আলাদা হলেও ভারতীয় বহু প্রাচীন ভাষাতে 'রাঢ়' শব্দটির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। সুকুমার সেনের মতে, সংস্কৃত অভিধানে 'রাঢ়' শব্দের অর্থ সৌন্দর্য বা বৈভব, সম্ভবত স্ত্রী লিঙ্গ শব্দটি 'রাজ্' ধাতু থেকে উদ্ভূত রাজ্+ত রাষ্ট্র অথবা রাজ্+এ রাষ্ট্র। সাঁওতালী ভাষায় 'রাঢ়ো' শব্দের অর্থ নদী গর্ভস্থ শৈলমালা বা পাথুরে লাল মাটি। আবার অঞ্চল ভিত্তিক সাঁওতালি ভাষাতে 'রাঢ়' শব্দের ভিন্ন অর্থ পাওয়া যায়। রাঢ়-সুর, লাড় (ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তন সঞ্জাত র>ল, ল>র) অর্থ সাপ। ভাষাতাত্ত্বিকদের ধারণা 'লাড়' শব্দটি মূলত অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠী থেকে এসেছে। হিন্দিতে 'রাঢ়' অর্থ নীচ। মারাঠিতেও একই অর্থ Rough savage. মৈথিল ভাষায় শব্দটির অর্থ নিম্ন জাতীয় লোক। এক সময় বৃহৎ ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রমে বিভাজিত সমাজের নিচুতলার প্রান্তিক এলাকায় বসবাসকারী শূদ্রদেরকে রাঢ় বলা হত। মধ্যযুগের কাব্যগুলোতে 'রাঢ়' শব্দটি বিশেষ করে জাতি ও দেশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

'রাঢ়' এক অতি প্রাচীন দেশের নাম। পূর্ব ভারতের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র ও সুহ্ম নামে যে অঞ্চলগুলি প্রচলিত ছিল, তার মধ্যে বঙ্গভূমির বৃহত্তম রাঢ়ের অবস্থান। প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ, ভাগীরথী, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি নদ-নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত, বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী, বহু সভ্যতা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে পশ্চিমবঙ্গের যে ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় রূপ গড়ে উঠেছে। রাঢ় অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ করা খুবই জটিল ও বিতর্কমূলক। কারণ, ভারতবর্ষের বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক প্রশাসনিক ক্ষমতার উত্থান ও পতনের ফলে রাষ্ট্রীয় সীমা পরিবর্তিত হয়েছে। এমনকি ভারতবর্ষে তৎকালীন প্রাকৃতিক কারণেও (নদ-নদীর গতি পরিবর্তনের জন্য) রাষ্ট্রীয় সীমা বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে বঙ্গের নাম, তার শিল্প-সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় সীমা বার বার পরিবর্তন হয়েছে। 'বঙ্গ' শব্দটির ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তাই রামায়ণ, মহাভারত, ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, প্রাচীন লিপি, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ ও ঐতিহাসিকদের দেওয়া গবেষণা বিষয়ক বিভিন্ন প্রামাণ্য তথ্য ও কিছুটা অনুমানের উপর নির্ভর করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয়।

রাঢ় অঞ্চল বলতে, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ও পশ্চিমবঙ্গের নিকটবর্তী নবগঠিত ঝাড়খন্ড রাজ্যের কিছু অংশকে বোঝায়। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়ভূমি হল দক্ষিণাংশের মধ্যভাগ। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার শাসনকার্য পরিচালনায় সুবিধার জন্য সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের এই তিনটি বিভাগের (প্রেসিডেন্সী, বর্ধমান, জলপাইগুড়ি) মধ্যে বর্ধমান বিভাগের বেশীর ভাগ জেলাগুলি নিয়ে রাঢ়বাংলা বা রাঢ়ভূমি গড়ে উঠেছে। সেগুলি হল- পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমের প্রায় সমগ্রাংশ। এছাড়াও রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সংলগ্ন ও নবগঠিত বিহার ও ঝাড়খন্ড রাজ্যের কিছু অংশ এই রাঢ়ভূমির অন্তর্গত। বিহারের ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, লোহারদাগা, কাহালগাঁও, মুঙ্গেরের কিছু অংশ এবং ঝাড়খণ্ডের দুমকা, দেওঘর ও মানভূম প্রভৃতি জেলাগুলি নিয়ে বর্তমান রাঢ়ভূমি গড়ে উঠেছে। ছোটনাগপুর মালভূমির নিম্নাংশই রাঢ় অঞ্চল। নবম-দশম শতকে এই রাঢ় বাংলাকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়েছিল- উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়, প্রাচীনকালে যা বজ্জভূমি ও সুহ্মভূমি নামে পরিচিত ছিল। নীহাররঞ্জন রায় প্রাচীনকালে দুই রাঢ়ের সীমানা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন-

> বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ অর্থাৎ কান্দি মহকুমা, সমগ্র মহকুমা, সমগ্র বীরভূম জেলা (সাঁওতাল ভূমিসহ) এবং বর্ধমান কাটোয়া মহকুমার উত্তরাংশ এই লইয়া উত্তর-রাঢ়। মোটামুটি অজয় নদী এই উত্তর রাঢ়ের দক্ষিণ সীমা এবং দক্ষিণ রাঢ়ের উত্তর সীমা।[১]

এ নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে পন্ডিত, ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণের মধ্যে তীব্র মত পার্থক্য দেখা গিয়েছিল। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, প্রাচীন রাঢ়দেশ সাধারণত গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগে সীমাবদ্ধ ছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে প্রাচীন রাঢ়ের সীমানা হল- উত্তরে মুর্শিদাবাদ থেকে দক্ষিণে মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, পূর্বে হাওড়া কলকাতা থেকে পশ্চিমে পুরুলিয়া ও সাঁওতাল পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত। সুকুমার সেনের মতে, একদা রাঢ়দেশ বলতে গঙ্গার ওপারের কিছু অংশ এবং এপারে দামোদরের প্রাচীন খাত বাঁকা বল্লুকা (বেহুলা) পর্যন্ত বিস্তৃত। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে রাঢ়ী উপভাষার দেশ বলতে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান এবং হুগলী প্রভৃতি জেলাগুলোকে বোঝায়। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে প্রাচীনকালে পূর্বে ভাগীরথী, উত্তরে ময়ূরাক্ষী, দক্ষিণে দামোদর ও পশ্চিমে ছোটনাগপুরের পার্বত্যভূমি পর্যন্ত বেষ্টিত বিস্তৃত ভূভাগ রাঢ় নামে পরিচিত ছিল। অতএব দেশ বা রাষ্ট্রের সীমা কোন চিরন্তন সীমারেখা দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না। শাসন ব্যবস্থার সুবিধার্থে কিংবা প্রশাসকের রাজনৈতিক ক্ষমতার দম্ভে(কখনো প্রাকৃতিক কারণে) রাষ্ট্রের সীমা বার বার

পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গসহ অন্যান্য প্রদেশ বা রাষ্ট্রের যে ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক সীমারেখা তা যে সুনির্দিষ্ট আছে তা বলা যায় না। রাষ্ট্রের সংকোচন প্রসারণ (উত্থান পতন) নির্ভর করেছে আগামী দিনের রাজনৈতিক কর্ণধারদের ক্ষমতা ও কর্মনীতির উপর। এক কথায় রাঢ় অঞ্চলের বিশাল আয়তন। যার উত্তরে রয়েছে বীরভূমের ময়ূরাক্ষী, দক্ষিণে পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম, পূর্ব দিকে পশ্চিম বর্ধমান ও হুগলীর আরামবাগ মহকুমা থেকে পশ্চিমে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব মেদিনীপুর বাদে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সংলগ্ন কিছু অংশ নিয়ে বৃহত্তর রাঢ় অঞ্চল। ভৌগোলিক অবস্থান এবং বিশাল ভূখন্ডের অধিবাসীদের তাদের আঞ্চলিকগত আচার-আচরণ ও সংস্কৃতিগত নানারকম পার্থক্য থাকার জন্য এই রাঢ় অঞ্চলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে- ১. পূর্বরাঢ় ২. পশ্চিমরাঢ়। আয়তনের দিক দিয়ে বিচার করলে, পশ্চিমরাঢ়ের আয়তন বড়। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমা, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলা হল পশ্চিমরাঢ়। বাকি অংশ পূর্ব রাঢ়।

পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে অনার্যরা বসবাস করছিল। অনার্যরা ছিল আদি-অস্ত্রাল জাতি। এই আদি-অস্ত্রাল গোষ্ঠী পশ্চিম প্রান্তিক রাঢ়ভূমির নৃতাত্ত্বিক বনিয়াদের ভিত্তি গড়ে তুলেছিল। এদের ভাষা, অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। আজও রাঢ়ভূমির আনাচে কানাচে এমন বহু সংখ্যক ভাষা প্রচলিত, যে ভাষাগুলির মূল উৎস অস্ট্রিক ভাষা। অস্ট্রিক ভাষাভাষী মানুষরা ভারতের আদি-অধিবাসী। এদের উত্তর পুরুষরা হল সাঁওতাল, মুণ্ডা, শবর, খেড়িয়া, লোধা, হো, ভূমিজ, বিরহড়, কোড়া, মাহলি ও অসুর প্রভৃতি জনজাতি। এই উপজাতি গোষ্ঠীর লোকেরা পশ্চিমরাঢ়ের আদি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী। আর্য সংস্কৃতির প্রসার ও প্রতিষ্ঠার পূর্বে সুদীর্ঘকাল ধরে পশ্চিমরাঢ়ে অনার্য জাতি গোষ্ঠীর প্রাধান্য ছিল এবং বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তুলেছিল।

আদিবাসী কথটির অর্থ 'আদিম যে বাসিন্দা'। আদিবাসী বলতে সাধারণত ভারতবর্ষে মানব সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে যে জাতি বিরাজমান সেই জাতি আদিবাসী নামে পরিচিত। সাধারণত যাদেরকে আদিবাসী বলে চিহ্নিত করা হয়, তারা সকলে আদিযুগ থেকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করে না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বসবাস করে। কারণ আদিযুগের মানুষেরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে, বিশেষ করে খাদ্যর সন্ধানে নানা স্থানে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াত। আবার কখনো কখনো নানান প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে তাদেরকে বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করতে হয়েছিল। আদিকাল থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী একই জায়গায় বসবাস করা কোনো গোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব নয়। বর্তমানে সমাজে আদিবাসী বলতে সেই সব জনগোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা নিজস্ব জীবন ধারণের মাধ্যমে প্রাচীন পদ্ধতিকে অনেকটা অপরিবর্তিত রেখেছে। এরফলে বিবর্তমান সমাজ জীবনের চলার পথে তারা অনেকটা পিছিয়ে

রয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানীদের ভাষায় এরা আদিবাসী। আদিবাসী শব্দ একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়- এটির ব্যবহার উপজাতি, জনগোষ্ঠী, কিংবা ইংরাজি শব্দ 'Tribe' অর্থে।

বাংলা সাহিত্যের আদিকাল থেকে আদিবাসী সমাজজীবনের চিত্র পাওয়া যায়। চর্যাকাররা ৯০০- ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে সাধনার গূঢ়ার্থ রচনা করেছিলেন। তারা সমাজের বিভিন্ন জাতির জীবনকে তুলে ধরে সাধনার গূঢ়ার্থ সম্পর্কে বোঝাতে চেয়েছিল। পরবর্তীকালে মঙ্গলকাব্যে আদিবাসী জীবনের বিভিন্ন লোকাচার প্রবল ভাবে দেখা যায়। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের পর উনিশ শতকের নবজাগরণের সময় আদিবাসীদের পরিচয় পাওয়া না গেলেও, কিছু জায়গায় তাদের আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তথাকথিত সমাজের উপর তলাকার মানুষের নিয়ে সাহিত্যে রচনা করলেও, তাঁর প্রবন্ধে বাঙালি জাতির উৎপত্তির কথা বলতে, আদিবাসী প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তাঁর বিবিধ প্রবন্ধের অন্তর্গত 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধে সাঁওতাল, হো, ভূমিজ, মুণ্ডা, বিরহড় ও খেড়িয়া প্রভৃতি আদিবাসীদের বর্ণনা করেছেন।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বিপ্লবের মাধ্যমে সাম্যবাদী সমাজ গঠনের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৯১৯ সালে তাসখন্দে মানবেন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তা ধারায় সমাজতন্ত্রবাদের অনুপ্রবেশে ঘটে, তা ধীরে ধীরে বাংলা সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। ১৯২৩ সালে *কল্লোল* পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে একদল তরুণ লেখকগোষ্ঠী সমকালীন সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যে রচনার বিপরীত পথে হাঁটতে শুরু করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবমুক্ত হওয়া কল্লোলীয়ানদের মূল উদ্দেশ্য ছিল।

কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকরা সমাজের প্রান্তবর্গীয় মানুষদের নিয়ে বাংলা সাহিত্যে এক নব দিগন্তের উন্মোচন করেছিল। কল্লোলের লেখকরা সহায় সম্বলহীন, প্রান্তবর্গীয় মানুষদেরকে সাহিত্যে তথা সমাজে পরিচয় দিয়েছিল। পূর্বসুরী সাহিত্যিকরা সমাজের প্রান্তবাসীদের বহু বিচিত্র জীবনযন্ত্রনার ঘটনা নিয়ে সাহিত্যে রচনা করেননি। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকরা প্রথম উপেক্ষিত মানুষের দিকে চোখ মেলে দাঁড়িয়েছিল। তাদের অস্তিত্বের নানা সংকট কাহিনির বয়ানে ব্যক্ত করতে চাইলেন। কথাসাহিত্যে এইসব ব্রাত্য চরিত্রগুলিকে বাস্তব পটভূমিতে যথাযোগ্য ও নায়কোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকরা সমাজের বুকে প্রান্তবর্গীয় মানুষদের অধিকার রক্ষা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে এক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন। যা সমকালীন সাহিত্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ। কল্লোলীয়রা নানা দিক থেকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে বিচার করে দেখার চেষ্টা করেছে।

বাংলা কথাসাহিত্যিকদের সাহিত্যে রচনার প্রধান উপাদান ছিল মানুষের প্রাত্যহিক জীবনচিত্র। বাংলায় এই কথাসাহিত্যের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা সার্থকভাবে সূচনা হয়েছিল। সমাজে প্রচলিত জাতিতত্ত্ব অনুযায়ী চারটি সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ভারতীয় মানব ইতিহাসে সমাজের উপরতলা মানুষের জীবনযাত্রার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া রাজ্যে আরও অন্য সম্প্রদায় মানুষের বসবাস দেখা গেলেও তাদের পরিচয় পাওয়া যায় না। কালের নিয়ম অনুসারে একদিন ইতিহাসের বিবর্তন ঘটে, একেই স্বামী বিবেকানন্দ 'শূদ্র জাগরণ' নামে অভিহিত করেছেন। সভ্যতার আদিলগ্নে ব্রাহ্মণরা সমাজের উচ্চপদে অবস্থান করলেও একদিন শূদ্ররা সেই পদে অধিষ্ঠিত হবে। সাহিত্যে সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যে সমাজের উপরতলার মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কাহিনি বর্ণনা করেছেন। নিম্ন শ্রেণি মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কাহিনি খুবই কম ছিল। বঙ্কিম পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যে বেশিরভাগ অংশে মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার কাহিনি পাওয়া যায়। আদিবাসী মানুষের জীবন কাহিনি বেশি পাওয়া যায় না। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বিলাসী' ছোটগল্পে সাপুড়েদের জীবনযাত্রা ও 'অভাগীর স্বর্গ' ছোটগল্পে সমাজের প্রান্তিক এলাকায় বসবাস করা শূদ্রদের জীবনযাত্রা বর্ণিত হয়েছে। বিশ শতকের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে প্রান্তজীবন ও চেতনার পরিচয় কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এই সময়ের কথাসাহিত্যে গণমুখী জীবন প্রান্তজনের প্রতিবাদী চেতনার জটিল রূপটি প্রকাশিত হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে তা আরও ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে, আখ্যানের চেহরা পালটে যায়। একই সঙ্গে গল্পের বিষয়, গড়ন, জনচেতনা ও পাঠক মন পালটে যায়। রবীন্দ্র উত্তর কল্লোলযুগে প্রথম তাদের আগমন ঘটে। এই পর্বে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের রচিত সাহিত্যেকে প্রথম স্থান দিয়েছিল। এরপর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরো অন্যান্য সাহিত্যিকদের কথাসাহিত্যে তাদের দেখা যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্প, ভ্রমণ সাহিত্যে ও উপন্যাসে আদিবাসীদের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আদিবাসীদের জীবনযাত্রা বর্ণনা করতে গিয়ে ছোটগল্প, উপন্যাসে তাদের দারিদ্র সুলভ জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির বিষয়কে তুলে ধরেছেন। তাদের আচার- আচরণ, নাচ-গান বিভিন্নরকম সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। একমাত্র মহাশ্বেতা দেবীর রচনায় আদিবাসী সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারনা পাওয়া যায়। মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী জাতিকে আপন করে তাদের দুঃখ বেদনাকে জানাতে চেয়েছেন যা তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রথম নেতা তিলকা মাঝি থেকে শুরু করে সিধু, কানহু, বসাইটুডু, দ্রৌপদী ও দুল্‌হন মাঝি কাউকে তিনি বাদ দেন নি। কালের নিয়ম অনুসারে তাদের দাবিকে তাঁর সাহিত্যে বর্ণনা করেছেন। তাই অন্যান্য সাহিত্যিকদের তুলনায় তাঁর রচনা অনেক বেশি জীবন্ত। এছাড়া আরো অনেক সাহিত্যিকদের রচনায় আদিবাসীদের জীবনযাত্রা ও

সংস্কৃতির পাওয়া যায়। যেমন- বনফুল, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, কমলকুমার মজুমদার, রমাপদ চৌধুরী, অনিল ঘোড়াই, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, নলিনী বেরা ও সৈকত রক্ষিত প্রভৃতি। শুধু প্রকৃতি নয় সাহিত্যিকরা সমগ্র জীবনের শিল্পী। সে জীবন সাঁওতাল, মুণ্ডা, শবর, লোধা ও খেড়িয়াদের দৈনন্দিন চালচিত্রের জীবন। বাংলা আখ্যান ভুবনে যা নতুন। এই সমস্ত সাহিত্যিকরা এক নতুন জীবনবোধ নিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যের ভুবনকে যেমন বিস্তৃত পরিসরে নিয়ে গেছেন তেমনি এনেছেন আখ্যানের নতুনত্ব। এখানেই তাঁদের অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব।

দ্বিতীয় অধ্যায়:

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি

শিল্প সাহিত্যের জগতে যাদের একসময় ঠাঁই হতো না, ভারতবর্ষের বর্ণবিভাজিত সমাজে যারা দারিদ্র ও পেশাগত কারণে সাধারণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে, নিজেদের শ্রম ও কৃষি যাদের একমাত্র সম্বল ছিল তারা কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের কাছে সমাদর-সহানুভূতি-শ্রদ্ধা লাভ করেছিল। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের কাছে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি সাহিত্যে-শিল্পের মূল বিষয়। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়(১৯০১-১৯৭৬) কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। বাংলা কথাসাহিত্যে তিনি প্রথম বিষয় ভাবনায় কয়লাকুঠির পটভূমি ও প্রেক্ষাপটে রচিত গল্প ও উপন্যাসে নতুন রকমের স্বাদ এনেছিলেন। *কল্লোল* বা *কল্লোল* পরবর্তী পত্রিকাগুলোতে তিনি কয়লাকুঠির কথাকার হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। কয়লাকুঠির পরিচয়-পরিবেশ-শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক সব কিছুই তাঁর রচনায় আঁ-কড়া হিসেবে ওঠে এসেছে। তিনি প্রথম 'কয়লাকুঠি' গল্পের মাধ্যমে লেখকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

ছোটগল্পের বিষয়বস্তু, ভঙ্গি ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে কল্লোল-চেতনার- বিরুদ্ধবাদে'র অংশীদার হিসেবে নিজেকে তাঁর সহযোগী সতীর্থদের সমসূত্রে গ্রথিত না করে তিনি এক পৃথক অবস্থান তৈরি করেছিলেন। নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আত্মপ্রক্ষেহীন নিরুত্তাপ এক নির্লিপ্তির সঙ্গে তিনি রচনা করেছেন সাওঁতাল-বাউড়িদের জীবনকাহিনী, পরে সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের ইতিকথা।

জোড়জানকী কয়লাখনিতে শ্রমিক হিসেবে সাঁওতাল ও বাউরি পুরুষ, মহিলা উভয়েই কাজ করত। ১৭৭৪-১৮৪০ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনের তুলনায় শ্রমিকদের চাহিদা কম থাকায় স্থানীয় গ্রামাঞ্চলের নিম্নবর্নীয় তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায়ের পুরুষ ও মহিলাদের কুলি-কামিনরূপে নিয়োগ করত। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিটি ছোটগল্পে খনি শ্রমিকদের অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত ভয়াবহ জীবনচিত্র পাওয়া গেলেও, অনার্য পুরুষ রমণীর কামাসক্তি তা অতিক্রম

করেছে। সাঁওতাল যুবক নানাকু ও বাউরি রমণী বিলাসী তারা দু'জনে ঝরিয়া ছেড়ে জোড়াজানকী কয়লাখনিতে পালিয়ে আসে। এখানে আসার পর নানকু ও বিলাসীর দাম্পত্য জীবনে সংকট দেখা দেয়। নানকু অপর এক কুলী রমণী মাইনুর প্রেমে পড়ে যায়। স্বামীপ্রেম বঞ্চিতা রমণী বিলাসী তার প্রেমিক খালাসী রমণার সঙ্গে থাকলেও তাকে বিয়ে করতে রাজী নয়। সে নানকুকে বিয়ে করতে চায়। নিরাপত্তাহীন কয়লাখনিতে চাপা পড়ে মৃত নানকুর সন্ধানে গিয়ে বিলাসীও ক্ষয়প্রাপ্ত কয়লা স্তূপের নীচে সমাধিস্থ হয়। 'ঝুমরু' গল্পে রূপসা কয়লাকুঠির সাঁওতাল কুলিদের দরিদ্রপীড়িত জীবনের একটি বড় সমস্যা হল বর্ষাকালে ছাতার অভাব। গল্পের শুরুতে প্রায় শোষিত অত্যাচারিত শ্রমিকদের চেতনার জাগরণের যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে বিদ্রোহের বীজ সুপ্ত থাকার সত্ত্বেও তা প্রজ্বলিত হয় নি। 'রূপসা' নামক ছোটগল্পে কয়লাকুঠির সাঁওতাল কুলি-কামিনদের আর্থিক অসহায় অবস্থার দিকটি বর্ণনা করেছেন।

> এই দুরন্ত বর্ষার দিনে ছাতি ছাড়া তাহাদের চলে কেমন করিয়া? একে তো ঘরের ফুটা চাল গড়াইয়া জল পড়িবে, তাহার উপর মেয়ে-ছেলে সকলে মিলিয়া খোলা মাথায় চলা ফেরা করিলে পরিনাম যাহা হইবে তাহা ভাবিতেও কষ্ট হয়। কোম্পানি ছাতা কিনিয়া দিবে না- নিজেদেরও তেমন সঙ্গতি নাই যে পয়সা খরচ করিয়া ছাতি কিনিবে। কাছে বনজঙ্গল থাকিলেও– বা শিয়াড়ি পাতায় ছাতি তাহারা নিজেরাই তৈরি করিয়া লইতে পারে।[২]

অভাবের তাড়নায় ক্ষেপে উঠা সাঁওতালরা শ্রেণিস্বার্থ রক্ষায় মালিকের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারত। কিন্তু গল্পকার সে বিষয়ে উদাসীন থেকে ফরিদপুরের জঙ্গলে শিয়াড়ি পাতা সংগ্রহ করতে গিয়ে ঝুমরু মতির প্রেমজ সম্পর্ক ও ঝুমরুর পালিতা মা দাসীর মাতৃত্বকে প্রধান বিষয় করে তুলেছেন।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অধিকাংশ ছোটগল্পগুলিতে জটিলতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। অন্যদিকে কল্লোল যুগের ভাববিহ্বলতা আর রোমান্টিকতা মিশ্রিত ভাবনার অভিঘাত তাঁর উপরে পড়েনি। সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে কল্লোলীয় ছক- যাযাবর কল্পনা, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আবেগের মিশ্রণ, রোমান্টিসিজমের মোহমাখানো জীবনায়ন, প্রেমের বর্ণনায় প্রাচীন রক্ষণশীল রীতির পরিবর্তে যৌন জীবনের অকপট প্রকাশের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব অনুসরণ না করে, তিনি এক নিজস্ব মৌলিক রীতি তৈরি করেছেন। ছোটগল্পগুলিতে সহজ সরল অনাড়াম্বর ভাষায় সহজলব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে দ্বন্দ্ব জটিলতা বিহীন জীবনের চালচিত্র এঁকেছেন।

ভারতবর্ষে বর্ণবিভাজিত সমাজ সৃজনের পিছনে কুটিরশিল্পের একটা সরল সম্পর্ক রয়েছে। কুটিরশিল্পকে অবলম্বন করে বহু সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ নানাভাবে সমাজ ও জীবনের প্রয়োজনে উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল। সমাজের অধিকাংশ মানুষের পেশা বর্ণভিত্তিক

ছিল তাই বর্ণভিত্তিক কুটিরশিল্পে নিযুক্ত মানুষ জাতি-বর্ণ-ধর্ম-গোষ্ঠী নিরপেক্ষ সংগঠিত স্থায়ী কর্মী হিসেবে উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের সময় রেলপথ ও কলকারখানা গড়ে ওঠায়- সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যপক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। এই পরিবর্তনের ধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছোট-বড় নানারকম শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। অন্যদিকে রেলপথ সম্প্রসারণের ফলে বিপুল পরিমাণ জ্বালানির প্রয়োজন হয়। কয়লা একমাত্র জ্বালনির উৎস হওয়ার ফলে কয়লাখনির উৎপাদন বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়। কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বেশি পরিমাণ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। আগে থেকে কয়লাখনির উৎপাদনের কাজে কিছু লোক যুক্ত ছিল। কিন্তু দেশীয় পদ্ধতিতে খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের জন্য যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হত, তাতে উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল পাওয়া যেত না। অধিক সংখ্যক মানুষ ব্যতীত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কোন বিকল্প রাস্তা ছিল না। সেদিন কয়লাখনিগুলোতে অসংখ্য শ্রমিক নিয়োগ হয়েছিল। এই সব শ্রমজীবী মানুষ সরাসরি খনিকর্মী হিসেবে যুক্ত হতে পারে নি। কারণ, কয়লাখনি মালিকরা স্বল্প সংখ্যক স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করে, বাকি কর্মীদেরকে ঠিকাদারদের মাধ্যমে নিয়োগ করত। কয়লাখনির ঠিকা কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ জীবন কয়লাখনি খাদের মতোই অন্ধকার ছিল। যেমন- ‘রেজিং রিপোর্ট’ নামক ছোটগল্পটি কয়লাখনি অঞ্চলকে নিয়ে রচিত। ‘রেজিং’ কথাটির অর্থ হল কয়লা তোলা। খনি থেকে কয়লা তোলার পর মালিকের কাছে মোট হিসাব পাঠাতে হয় তাকে ‘রেজিং রিপোর্ট’ বলে। সমস্ত কয়লাখনিতে উৎপাদনেই হল প্রথম ও শেষ কথা। অতিরিক্ত উৎপাদনের প্রত্যাশায় প্রতিদিন শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কয়লাখাদের গহ্বরে প্রতিনিয়ত জীবনহানির আশঙ্কায় জমি দিয়ে কিংবা অমানবিক অত্যাচার করেও শ্রমিকদের ধরে রাখা সম্ভব হত না। নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিনিয়ত খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের মৃত্যু ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। আধুনিকীকরণের আগে কয়লাখনিগুলি শ্রমিকের কাছে মৃত্যুপুরীর সমান ছিল। ব্যপক হারে কয়লা উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কয়লাকুঠি প্রতীকের কথাকার। কয়লাকুঠি এলাকার ভৌগোলিক পরিচয়, পরিবেশ–শ্রমিক-মালিক জীবনপ্রবাহ-মানবপ্রকৃতি মোটামুটি সবকিছু তাঁর রচনায় আঁ-কড়া হিসাবে পাওয়া যায়। তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্পে সাঁওতালরা কুলিমজুর। এরা বিশেষত রাণীগঞ্জ, উখরা, দিশেরগড় অঞ্চলের কয়লাখনিতে কর্মরত। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সেই সব সাঁওতাল কুলিমজুর-দিনমজুরদের নিয়ে বিচিত্র পটভূমিকায় ছোটগল্প লিখেছেন। সাঁওতাল খনি শ্রমিকদের জীবন তাঁর ছোটগল্পে নানাভাবে পাওয়া যায়। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে দুটি দিক লক্ষ্য করা যায়, একদিকে কয়লাকুঠির মালিক, ম্যানেজার ও প্রশাসন আর অন্যদিকে দৈনন্দিন খেটে খাওয়া কুলি-কামিনদের দল। ম্যানেজারের দ্বারা নব

নিযুক্ত কুলি-কামিনের দলকে আড়কাঠির মাধ্যমে এক কয়লাকুঠি থেকে অন্য কয়লাকুঠিতে কিংবা চা বাগানে টাকা পয়সার লোভ দেখিয়ে চালান করে দিত। এর পরিণাম হিসেবে সহজ সরল কয়লাখনির কামিনরা প্রতিনিয়ত দালালদের যৌন লালসায় শিকার হত।

কয়লাকুঠি পরিচালনার দায়িত্বে বড়বাবু কিংবা রেজিংবাবুরা থাকত, তবে বড়বাবু কিংবা রেজিংবাবুর দল কেউ শেষ পর্যন্ত কয়লাকুঠিতে স্থায়ীভাবে থাকতে পারত না। অনেক সময় বড়বাবু কিংবা রেজিংবাবুরা কয়লাখনি শ্রমিকদের প্রতি বেশি মানবিক হওয়ার কারণে ম্যানেজারের চক্রান্তে চাকরি জীবন থেকে বরখাস্ত হয়েছে। এছাড়াও কয়লাখনি শ্রমিকদের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার মধ্যে কোন বিপর্যয়ে ব্যথাদীর্ণ হয়ে, মর্মাহত হয়ে কিংবা বিচ্ছেদ-বিধুরতায় আক্রান্ত হয়ে কয়লাকুঠির চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। একসময় লেখক নিজে বড়বাবু কিংবা রেজিংবাবুর দলের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। কারণ, লেখক সাময়িক কিছু সময়ের জন্য কয়লাকুঠিতে চাকরি করেছিলেন এবং সহানুভূতিশীল মন নিয়ে কয়লাখনি শ্রমিকদের জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। কয়লাখনিতে চাকরী করার সুবাদে ম্যানেজারদের মনুষ্যত্বহীন অত্যাচার সহজ-সরল সাঁওতাল দিনমজুর এবং তাদের পরিবার জীবন ও গোষ্ঠীর মর্মান্তিক পরিস্থিতি তিনি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু নীরবে সহ্য করা ছাড়া তাঁর কোন উপায় ছিল না। তাই তিনি পরিবারে আর্থিক অনটন থাকা সত্ত্বেও চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কয়লাখনি অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী লোকজন তারা কেউ শোষণযন্ত্রের চালক, কেউ বা সেই যন্ত্রচালকের সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করত। এদেরকে নিয়ে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ধনতন্ত্রের- বণিকতন্ত্রের শোষক মূর্তি, নরখাদক মূর্তিকে অঙ্কন করেছিলেন। শোষকদের কথা অনুযায়ী এরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিযুক্ত থাকত। আড়কাঠি'রা শোষিত ও শোষকের মাঝে থাকে, অপরদিকে শোষকের কাছাকাছি অবস্থান করে। কয়লাখনি শ্রমিকদের উপর বিশ্বাসঘাতকতা করে বণিকতন্ত্রের শোষণযন্ত্রকে সচল রেখেছিল। আবার বড়বাবু ও রেজিংবাবুরা শোষণযন্ত্রের অংশ হয়েও শোষিতজনের খুব কাছাকাছি অবস্থান করে, তবে আর্থ-সামাজিক-মানবিক এইসব দিক থেকে আড়কাঠিদের চেয়ে অনেক উঁচুতে অবস্থান করে। কখনো বড়বাবু ও রেজিংবাবুরা শোষিতদের পক্ষ নেওয়ার ফলে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছে, অথবা কয়লাকুঠির জীবন থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়ে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে শোষিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এরা কেউ মালিক নয় বা মালিকের উত্তরাধিকারীও নয়, কিন্তু খনি পরিচালনা ও মুনাফা বৃদ্ধিতে এদের মুখ্য ভূমিকা ছিল। খনি-শ্রমিকদের উপর শারীরিক অত্যাচার ও পীড়ন চালিয়ে শোষণ করে। কয়লাখনি থেকে যত বেশি সম্ভব মুনাফা অর্জন করা যায়। শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও মজুরি বৃদ্ধি কোন কিছুই তাদের কাছে গুরুত্ব পায়নি। বড়বাবু, রেজিংবাবুদের একটাই উদ্দেশ্য বেশি করে মুনাফা অর্জন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কোথাও কোম্পানীর ব্যক্তি মালিকানার দাপট দেখান নি, ম্যানেজারকে দন্ডমুন্ডের কর্তা করে

পরোক্ষে ব্যক্তি মালিকানার স্বেচ্ছাচারী অমানবিক রূপ গল্পে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর ছোটগল্পগুলিতে কয়লাখনি অধ্যুষিত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ জীবনের প্রকাশ পেয়েছে। শুধুমাত্র শ্রমজীবী মানুষরা নয়, খনি অঞ্চলের সব মানুষের মধ্যে যে জৈবিক প্রবৃত্তিতাড়িত মানুষ আছে, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক মানদন্ডে তা ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। তাঁর ছোটগল্পগুলি পরিবেশ ও পটভূমির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রচনা করেছেন। যা তাঁকে পূর্ববর্তী ও সমকালীন সাহিত্য থেকে ভিন্ন স্বাদের বলে মনে হয়। গল্পে তিনি শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকা জীবনের কথা বলেছেন ঠিকই কিন্তু সে জীবন তাদের শ্রেণি সংঘর্ষের উত্তীর্ণ জীবন নয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পগুলিতে শ্রেণীসংঘর্ষ দেখাতে চেয়েছিলেন। সেদিক দিয়ে বিচার করলে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প শ্রেণি চেতনাকে উজ্জীবিত করেননি। ছোটগল্পে মানুষের হৃদয় অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি দেখাতে চেয়েছেন প্রকৃত মানুষের হৃদয়। তাঁর বেশিরভাগ ছোটগল্পগুলিতে সমাজের অবক্ষয়িত রূপ ধরা পড়লেও, শ্রমজীবী মানুষের সার্বিক চেতনাকে বাস্তাবায়িত করতে পারেনি। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে সাহিত্যে এক নতুন যুগের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে, সেখানে সাহিত্যের তত্ত্ব বড় কথা নয়, শ্রমজীবী অশিক্ষিত মানুষগুলির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতায় অত্যাশ্চার্যভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। যা বাংলা সাহিত্যে একদিন দুর্লভ ছিল। তিনি শ্রমজীবী মানুষের সমাজে অর্থনৈতিক দিকটিকে প্রাণবন্ত করতে গিয়ে বাংলা সাহিত্যে যে পালা বদলের সূচনা করেছিলেন, সেখানে বাংলা ছোটগল্প মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়:
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে আদিবাসী জনজাতির আখ্যান বাস্তবতা ও বিশ্লেষণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বের মাঝামাঝি সময়ে পৃথিবীর ইতিহাস যখন কেবল রক্তক্ষয়ী অবমাননার দলিল, সারা বিশ্বে এক উত্তাল পরিস্থিতি, *কল্লোল, কালি-কলম* পর্বের অতি রুক্ষ অবক্ষয়িত বাস্তব যখন বাঙালি পাঠক সাধারণের মনোভূমিকে ওয়েস্টল্যান্ড করে তুলেছিল সেই পর্বে বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯৪-১৯৫০) আবির্ভূত হয়েছিলেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্য এক অনন্য কথাকার। তাঁর হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে প্রাঙ্গণে একে একে গ্রামবাংলার নিস্তরঙ্গ জীবন পাঁচালি ওঠে এসেছিল। *কল্লোল* পত্রিকাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি মাইল-ফলক রূপে ধার্য করা হয়। *কল্লোল* (১৯২৩) পত্রিকা প্রকাশের এক বছর আগে বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। *কল্লোল* যুগের একদল লেখক সাহিত্যে রবীন্দ্র সৃষ্ট পথের বিরোধিতা করে অন্য পথে চলার প্রয়াস করেছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই

সময়ের মধ্যে দিয়ে নিজের সৃষ্ট সাহিত্যে পথে হেঁটেছেন, সময়টাকে ভালোভাবে অনুভব করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর(১৮৬১-১৯৪১)'কে পাশ কাটানোর নামে এই সময় রবীন্দ্র বিরোধিতার ঝড় উঠেছিল। তিনি কোনদিন নিজেকে সেই দলে অন্তর্ভুক্ত করেননি। তিনি তাঁর ১৯২৯-এ *পথের পাঁচালী'র* সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, যে রবীন্দ্রনাথের দেখানো পথ থেকে বেরিয়ে অন্য পথে হাঁটা সম্ভব। কিন্তু তার জন্য মহান সাহিত্যিক ও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকে যুক্তিহীন উদ্দেশ্যমূলক সমালোচনায় ক্ষতবিক্ষত করার প্রয়োজন নেই। তিনি বারবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তাঁর রবীন্দ্র বিষয়ক প্রবন্ধে ('রবীন্দ্রনাথ', 'রবিপ্রশস্তি', ও 'প্রথমদর্শনে') তারই প্রমাণ মেলে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোনোদিনই *কল্লোল* লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগদান করেননি। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে পশ্চিমী সাহিত্যের মোহে অন্ধ না হয়ে, তিনি সাহিত্যে নিয়ে এলেন দেশজ উপকরণ-গ্রামের সহজ সরল অবহেলিত পতিত জীবনের অফুরন্ত সঞ্চয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাতেও দেশজ উপকরণ রয়েছে, তবে তাঁর সাহিত্যে মানুষের জৈবিক চেতনার তীব্রতা বেশি প্রখর ছিল। এছাড়াও আদিম প্রবৃত্তি, ক্রোধ, লোভ ও হিংসা ছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এইসব বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেননি। তাঁর অধিকাংশ সৃষ্টি চরিত্রগুলি কল্পনার গাঢ় রঙে রঞ্জিত নয়। গ্রামে কিংবা শহরে একেবারে নগন্য অবহেলিত সাধারণ পতিত মানুষদের বিড়ম্বিত জীবন ও নির্মম বাস্তব রূপ সবই তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন। তাঁর দৈনন্দিন বাস্তব জীবনে দেখা ঘটনাগুলি সাহিত্যে উপস্থাপিত করেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ছোটগল্প, উপন্যাস, দিনলিপি বা ভ্রমণকাহিনিগুলি তারই প্রমাণ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পটিতে 'কালচিতি' নামক ছোটগল্পটিতে আদিবাসী সাঁওতাল ও মুণ্ডাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অবস্থান ধরা পড়েছে। গল্পটিতে মুণ্ডা সম্প্রদায়ের আশ্চর্য এক জীবন সংগ্রামের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন-

> ...ভিজে চাল নুন দিয়ে খেয়েছে। এ সব বন্য দেশে আটা ছাতু প্রভৃতি খাদ্য একেবারে অচল। এরা ভাত ছাড়া আর কিছু বোঝে না। এমনকি তরকারি পর্যন্ত খায় না, হয়তো একটু শাকভাজা আর নুনের টাকনা দিয়ে এক বড় জামবাটি ভর্তি পান্তাভাত দিব্যি মেরে দিলে। তাতেই এদের সবল স্বাস্থ্যবান পাথরেকোঁদা চেহারা, ধনুকবাণ নিয়ে বড় বাঘ ও বুনো হাতি আর ভীষণ বিষধর শঙ্খচূড় সাপের সামনে এগিয়ে যাবে নির্ভয়ে। আর ভালুক? সে তো এদের ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়। সন্ধের অন্ধকারে বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘোরে।[৩]

গনু সর্দারের দেশলাই চাওয়া, কাঁচা শালপাতায় জড়ানো তামাকের পাতা বিড়ির মতো করে আধহাত লম্বা, পিকা খাওয়া সবই জীবন্ত ও বাস্তব ছবি।

হে অরণ্য কথা কও(১৯৪৮) দিনলিপিটি ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে রচিত। আলোচ্য দিনলিপিটিতে ধলভূমগড়, পশ্চিম সিংভূমের সারান্ডা ফরেস্ট, ঘাটশিলার পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ আছে। তিনি ভ্রমণে বিভিন্ন আদিবাসী (সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা প্রভৃতি) সম্প্রদায়ের মানুষগুলির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাই তিনি তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বাস্তব ছবি আঁকতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্য তাদেরকে চাকুলিয়ার হাটে আসতে হত। একসময় তিনি সাঁওতাল মেয়েদেরকে চাকুলিয়ার হাটে ঝাড়ু বিক্রি করতে দেখেছিলেন। তাদের নিত্যদিন বন্যজন্তুর সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার সাহসিকতার কথাও লিপিবদ্ধ করেছেন। লাখন মাঝি ভাল্লুকের আক্রমণে তার একটা চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। জঙ্গলে বসবাস করা আদিবাসীরা চরম দারিদ্র ও স্থানীয় শাসকের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। প্রবল শীতেও তাদেরকে গাছের তলায় একমাত্র খেজুরের ছেঁড়া চাটাই ও আধছেঁড়া পাতলা মলিন কাঁথাকে সম্বল করে রাত কাটাতে হত। এই অসহায় মানুষগুলির করুণ অবস্থা দেখে তাদের প্রতি সহমর্মিতা হয়ে লিখেছেন-

> এই দরিদ্র সরল লোকগুলিই ভারতবর্ষের প্রাণবস্তু। অথচ কি দুঃখপূর্ণ জীবন এদের! নিরাবরণ আকাশতলে হিমবর্ষী রাত্রে কাঁথা গায়ে শোবে, বাঘের মুখে রাত্রে গাড়ি চালাবে— মজুরি কত, না দৈনিক এক টাকা।[৪]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন-আত্মা-শিল্পচেতনা এক ভিন্ন মেজাজে রাঙিয়েছেন। তাঁর রচনায় প্রকৃতি বর্ণনা, অধ্যাত্ম-চিন্তা কিংবা নিরন্ন সাধারণ মানুষের জীবনবোধকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এক কথায় মানব জীবনের বিচিত্র চিন্তা ভাবনাকে আশ্রয় করে তাঁর সৃষ্টির সম্ভারকে পূর্ণ করেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্পগুলির পটভূমি হল পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের গ্রাম। গ্রামের পরিবেশ এবং সেই পরিবেশে বসবাস করা দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। এরা সব সময় সভ্য সমাজের বাইরে অবস্থান করে। সেই সব গ্রাম্য পরিবেশের মানুষগুলো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পকে আলাদা মাত্রা দান করেছে। প্রকৃতির সমস্ত কিছু তাঁর কাছে মূল্যবান, চারপাশে ঘটে যাওয়া অতি তুচ্ছ বিষয় কিংবা ঘটনাকে সহজ সরল ভাষায় পাঠকের চোখের সামনে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সমাজে যারা অবহেলিত, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষদের দুঃখ যন্ত্রণা দেখে কোনোদিন বিরক্তিবোধ করতেন না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার মূলে এইসব মানুষরা বেশি করে বিরাজ করে। তাদের দৈনন্দিন জীবনে

ঘটে যাওয়া বাস্তব অভিজ্ঞতাকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্প, দিনলিপি ও ভ্রমণকাহিনিতে পশ্চিমরাঢ়ের আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। তিনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)'র মতো রাঢ় অঞ্চলের সাঁওতালদের অর্থনৈতিক সংকট কিংবা তাদের অতীত গণসংগ্রামের ইতিহাসকে প্রধান বিষয় করে তোলেননি। সাহিত্যে অরণ্য আর আদিবাসীদের অভিন্নসত্তাকে আবিষ্কার করেছেন। 'শিকারী' ও 'কালচিতি' ছোটগল্পে স্বাধীনতা লাভের পূর্ববর্তী সময়ের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সামগ্রিক অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৫-১৯৩২) *বিদ্রোহ* (১৮৯০) উপন্যাসে আদিবাসী চরিত্রের প্রতিনিধি জঙ্গুর অরণ্যপ্রদেশ-এ ফিরে যেতে চেয়েছিল। পরবর্তী কালে মহাশ্বেতা দেবীর (১৯২৬-২০১৬) *অরণ্যর অধিকার* (১৯৭৭) উপন্যাসে আদিবাসী চরিত্র বীরসা মুণ্ডা অরণ্যর যাবতীয় অধিকার ফিরে পাওয়া ও ব্রিটিশদের শোষণ শাসন থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। কিন্তু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প কিংবা উপন্যাসের চরিত্রে নীরবতার মধ্যে দিয়ে পাঠক হৃদয়ে তাদের হয়ে প্রতিবাদের অনুভূতি জাগিয়ে তোলেন।

চতুর্থ অধ্যায়:
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি

ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে এক জমিদার পরিবারে কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের(১৮৯৮-১৯৭১) জন্ম হয়। রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্গত বীরভূম জেলার প্রায় একতৃতীয়াংশ ভূ-প্রকৃতি হল রুক্ষ-কঠোর রাঙামাটি। এই প্রকৃতি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের(১৮৯৪-১৯৫০) চোখে দেখা প্রকৃতি নয়। রাঢ় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি গ্রীষ্মকালের প্রখর সূর্যের তাপে মাটি গরম হয়। অনেকটা আগুনে পোড়া লোহার মতো লাল হয়ে যায়। এই মাটি কোদাল বা গাঁইতি দিয়ে কাটা যায় না, ধার বেঁকে যায়। কোদাল বা গাঁইতির মতো কৃষিকাজের যন্ত্র দিয়ে কোপ দিলে খানিকটা কাটে কিন্তু প্রতি কোপে আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ে। যে রাঙামাটির দেশ একদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উদাস করে তুলেছিল আর সেই রাঢ় অঞ্চল অন্তর্গত রাঙামাটির দেশে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। জন্মভূমির প্রতি অগাধ ভালোবাসার টান থাকার জন্য জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বেশির ভাগ তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যে রাঢ় অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি এই মাতৃভূমির ঐতিহ্যর গৌরবকে মহিমান্বিত করার উদ্দেশ্যে আজীবন নিজের সাহিত্য জীবনের সাধনাকে বা তপস্যাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। রাঢ় অঞ্চলের রাঙামাটি আপন ঐতিহ্যর উপহার স্বরূপ শিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে একজন শ্রেষ্ঠ তপস্বী হিসাবে ভারতীয় সাহিত্যের সাধনপীঠে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। রাঢ় অঞ্চলের রাঙামাটি তাঁর জন্মভূমি। জন্মভূমির ভূখন্ড মনস্তাত্ত্বিক ঐতিহ্য সিক্ত ও স্নাত।

পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যে সাধনা সেই পথে মনোনিবেশ করেন, সমগ্রজীবন ধরে নিরন্তরে মাতৃঋণ পরিশোধের চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এইসব কারণের জন্য তাঁর সাহিত্যের ভৌগোলিক মানচিত্রে বীরভূমের চিত্রটি এক বিশেষ জায়গা জুড়ে(অবস্থান করে) অবস্থিত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের জগৎ একটা নির্দিষ্ট ভূখন্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তাঁর সাহিত্যের অধিকাংশ চিত্রিত চরিত্রাবলীর ভৌগোলিক পটভূমি হল বীরভূম-বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ-কলকাতা, এছাড়াও উড়িষ্যা-ঝাড়খন্ড -দিল্লি এমনকি ওপার বাংলার সুদীর্ঘ অঞ্চল জুড়েও বিস্তৃত। তিনি সাহিত্যে সাধনার প্রথম থেকে নিজের জেলা বীরভূমকে কলমের ডগায় অক্ষরে অক্ষরে সাজিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। শুধু স্বপ্ন দেখা নয়, সারাজীবন ধরে তিনি সেই স্বপ্নকে বাস্তাবায়িত করার জন্য সাধনা করেছেন। তিনি সাময়িক কিছুদিনের জন্য জমিদারী তদারকির কাজে বীরভূম জেলার একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল গোগো, দোগাছি, বেলেড়া, ভালাস মস্তোলী প্রভৃতি বহু গ্রামে গেছেন প্রজাদের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন এবং অনেক সময় তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সুখ দুঃখের অংশীদার হয়েছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাস রচনার কেন্দ্রবিন্দুতে বাংলার প্রকৃতি-জনপদ, বাঙালির জীবন-চর্যা, ধর্ম-সংস্কৃতি, বিশ্বাস-সংস্কার, দেব-দেবী, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি দু'চোখ ভরে দেখেছেন 'শাক্ত-বৈষ্ণব সংঘর্ষের বাস্তব রূপ। যেমন- জেলে, মুড়ি ভাজুনী, মেথর ও চাকরদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ছিল। এছাড়াও পটুয়া, বেদিয়া, বাজিকর, সাপুড়ে ও বাউল-বৈষ্ণব প্রভৃতি যারা লাভপুরের বাড়ির আনাচে-কানাচে ভিক্ষা করে বেড়ায় তাদের সম্পর্কেও তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলিটি পূর্ণ ছিল।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঘাসের ফুল' ছোটগল্পে রাণীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলের আদিবাসীদের জীবনযাত্রা বর্ণিত হয়েছে। রাণীগঞ্জ কয়লাখনি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সাঁওতাল কুলি-কামিনদের দারিদ্রপূর্ণ জীবনযাপনের এক নিখুঁত বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পে কয়লাখনি অঞ্চলের জীবনযাত্রাকে আরো সুন্দর ও বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থাপিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন-

> যন্ত্রের নির্মম পেষণে এইভাবেই কত 'ঘাসের ফুল' অনুক্ষণ বিদলিত হচ্ছে। কয়লাকুঠীকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রথম গল্প লেখেন শৈলজানন্দ। কিন্তু তারাশঙ্কর কয়লাখনির পরিবেশকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনায় সম্পূর্ণায়িত করেছেন। পাতালপুরীর অগ্নিগর্ভ পরিবেশে প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল ঘটনারাজির মধ্যে একটি 'ঘাসের ফুলে'র অভিশপ্ত হৃদয়মাধুর্যকে লেখক যে-ভাবে অনাবৃত করেছেন তা তাঁর সৃজনীপ্রতিভার অতুলনীয় নিদর্শন।[৫]

রাণীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলে চুড়কী নামের এক সাঁওতাল মেয়ের জীবনকে কিভাবে ঘাসের ফুলের মত চূর্ণ বা পেষণ করা হয়েছে সেই করুণ চিত্র 'ঘাসের ফুল' ছোটগল্পে লেখক তুলে

ধরেছেন। কয়লাখনিগর্ভে আগুন জ্বলে উঠা, আগুনের হাত থেকে খনিজ সম্পদকে রক্ষা করতে গিয়ে বহু আদিবাসী শ্রমিকরা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে একত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সেই বিপদমুখী কাজ করতে গিয়ে চুড়কীর মতো বহু আদিবাসী শ্রমিককে যন্ত্রের নিষ্পেষণে ঘাসের ফুলের মতো দলিত হয়ে অকালে খনিগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। এই সব সাধারণ খেটে খাওয়া আদিবাসী শ্রমিকদের নাম সরকারী কোন নথীতে পাওয়া যায় না, এরা 'বেওয়ারিশ লাশ হিসেবেই খনিগর্ভে পড়ে থাকে। এভাবে এক শ্রেণির দালালরা আদিবাসী খনি শ্রমিকদের জীবনকে নিয়ে প্রতিনিয়ত দর কষাকষি করে। দালালদের কাছে আদিবাসীদের জীবনের কোন মূল্য নেই। দালালরা পয়সার বিনিময়ে তাদেরকে কেনাবেচা করে। লেখক গল্পের মাধ্যমে কয়লাখনি অঞ্চলের সেই বাস্তব সত্যকে তুলে ধরেছেন। 'শিলাসন' ছোটগল্পটিতে কোথাও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের উল্লেখ নেই। গল্পের মধ্যে আদিবাসীদের যে ধর্মীয় সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় তাতে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অনেক মিল রয়েছে। আদিবাসী মানুষেরা সাধারণত সহজ সরল অরণ্যবাসী নিষ্ঠা পরায়ণ তাদের ব্যক্তিগত সংস্কার নিয়ম নিষ্ঠা, দেবতার প্রতি অসীম বিশ্বাস, পবিত্রতার কাছে শিক্ষিত, যুক্তিবাদী, বাকবৈদগ্ধ্যেপূর্ণ, ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত অমলের সংস্কারমুক্ত মনকে নত হতে হয়েছিল।

রাঢ় অঞ্চলের বেশিরভাগ অংশ আদিবাসী অধ্যুষিত, তাই রাঢ় অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিতে আদিম কৌম সংস্কৃতির উপাদানগুলো বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। এই অঞ্চল থেকে সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুরের বিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে আদি অস্ট্রাল বা নিষাদ ও দ্রাবিড় ভাষী দাস-দস্যুদের বসতি, উত্তরবঙ্গের কিরাত-সংস্কৃতির সঙ্গে হিন্দুসংস্কৃতির মিশ্রণ দেখা যায়, রাঢ় অঞ্চলেও তেমনি নিষাদ-দাস-দস্যু সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে। এই সংস্কৃতির উত্তরাধিকার হিসেবে বহন করে চলেছে রাঢ় অঞ্চলের উপেক্ষিত জনসমাজ- তথাকথিত হাড়ি-বাগদি, বাউরি, ডোম, কাহার ও সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম জনজাতি। এই আদিম জনজাতিদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজজীবনের বিচিত্র রকমের ধ্যান-ধারণা অত্যন্ত সক্রিয় যা পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প- উপন্যাসের প্রতি পরতে পরতে প্রতিফলিত হয়েছে। এই ব্যক্তিগতভাবে চেনাকে একমাত্র সম্বল করে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তার ভদ্র সমাজের অমার্জিত মুখের ভাষা ও সংস্কৃতিকে তাঁর সাহিত্যে শিল্পে নিজের মতো করে লিখে গেছেন যা বর্তমানে সামাজ বিজ্ঞানী গবেষকদের কাছে তৎকালীন সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম এক জীবন্ত দলিল হিসেবে দাবি করে।

পঞ্চম অধ্যায়:

মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি

মহাশ্বেতা দেবীর কর্মের জগৎ বহুমুখী। আকৃতিতে বিশাল এক ভিন্ন জগত, সচরাচর সেই জগত চেনা জগতের বাইরে এক ভিন্ন জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি জগতেই বা কেমন? ইতিহাস আর ভূগোলকে সঙ্গে নিয়ে সেই জগৎ যখন ভিন্ন হয়ে ওঠে, অন্য এক জগৎ সৃষ্টি করেন, তখন সেটাই বা কেমন, আর সেই সৃষ্টির মধ্যে কতটুকুই বা স্রষ্টা উঠে আসেন? কোথায় তাঁর আন্তরিকতা আর স্বাতন্ত্র্য, যেখানে তিনি অন্যদের তুলনায় আলাদা হয়ে যান। এইসব কৌতূহলের পিছনে লুকিয়ে রয়েছে তাঁর সৃষ্টি সাহিত্য জগতের আলাদা এক ঠিকানা যেখানে সমাজের প্রতিটি মানুষকে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শিক্ষা দেয়, আর এখানেই তিনি স্বার্থক হন।

মহাশ্বেতা দেবীর তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ১৯২৬-১৯৭০ সাল পর্যন্ত জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁকে প্রতি মুহূর্তে প্রচুর লড়াইয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। এই সময় তিনি কোন স্থায়ী কাজ পাননি। এই আত্মসংগ্রামে নিমগ্ন জীর্ণ মানুষটি কখনও পরাজয় লাভ করেছে, আবার কখনও তিনি সমস্তরকম প্রতিবন্ধকতাকে হার মানিয়ে জয়ী হয়েছিলেন। তাঁর জয়ের ভাগটাই বেশি ছিল। এই আত্মসংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য তিনি শ্রম সংযুক্তি ও ত্যাগকে হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিয়েছলেন। তাঁর 'তৃষ্ণা', 'রঙ্গায়ালী', 'আশু ডাক্তারের বাড়ি', 'পরম আত্মীয়', 'ছায়াবাজি', 'শান্তি' ও 'ননীগোপালের জমা খরচ' প্রভৃতি ছোটগল্পগুলিতে সংযুক্তি ও ত্যাগকে তিনি অতি সজাগভাবে ব্যবহার করেছেন। যেমন- 'ছায়াবাজি' ছোটগল্পে নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে উঠে আসা এক মেধাবী ছেলের জীবন কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। অতি শৈশব থেকেই বাড়ির লোকদের কাছ থেকে আলাদা খাতির পাওয়ার ফলে সে উদ্ধত হয়ে উঠেছিল, সবাইকে উপেক্ষা করে সে এক আঁতেল এ পরিণত হয়েছিল। ফলস্বরূপ, বিজয় একদিন একান্ত কাছের লোকজনদের কাছ থেকে অনেকটা দূরে সরে গিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত সে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।

মহাশ্বেতা দেবীর ব্যক্তিগত সংগ্রামই ১৯৭০ সালের পরবর্তী সময়ে শ্রেণিগত সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি যে শ্রেণির প্রতিনিধি হয়ে কথা বলেছেন তারা হল সমাজের বঞ্চিত, নিরন্ন, অবহেলিত, নিম্ন শ্রেণির মানুষ। তাঁর 'বেহুলা', 'শূন্যস্থান পূর্ণ করো', 'বিশ-একুশ', 'অপারেশন? বসাই টুডু' ও 'দ্রৌপদী' প্রভৃতি ছোটগল্পগুলিতে সংগ্রামের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁর বেশিরভাগ ছোটগল্পগুলোতে দেখিয়েছেন, সমাজের উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের সম্পর্ক কখনো সমান্তরাল হতে পারে না। কারণ, একদিকে রয়েছে শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা-উদাসীনতা আর অপরদিকে রয়েছে যন্ত্রণা ও ক্ষয় প্রতিরোধের চেষ্টা, তাদের স্বার্থ কায়েম করতে দুই শ্রেণির

মধ্যেই আপ্রাণ চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, এতে সংঘাত অনিবার্য। তিনি নিজের অভিজ্ঞতায় জেনেছেন সমাজের উচ্চবর্ণের শোষণ এবং নিম্নবর্ণের সংগ্রাম দুটিই আজীবন চিরন্তন সত্য। এ থেকে মুক্তির জন্য একটি মাত্র উপায় হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে শ্রেণিবদ্ধভাবে সংগ্রাম করা। তাঁর সাহিত্যের মূল বিষয় হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। তিনি সমাজের উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের শ্রেণিদ্বন্দ্বে তিনি সমাজের অবহেলিত, শোষিত, বঞ্চিত ও অবদমিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, প্রতিনিয়ত তাদের অভাব অভিযোগের অংশীদার হয়েছেন। 'অপারেশন? বসাই টুডু' গল্পের কালীবাবু, 'বেহুলা' গল্পের বসন্ত ও 'শূন্যস্থান পূর্ণ করো' ছোটগল্পে মতিবাবু প্রভৃতি চরিত্রে তারই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

মহাশ্বেতা দেবী দেশের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক চেহারা দুচোখ ভরে দেখেছেন, কিন্তু রাজনীতির নগ্ন চেহারার সঙ্গে তিনি কখনো নিজেকে জড়াতে চাননি। একই সঙ্গে আপসও করেন নি, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতায় সবসময় দেশের মূল ও স্থায়ী সমস্যা সমূহের সমাধান হয় না। আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে ভূমিহীনকে ভূমি দান, ভূমিদাস প্রথা বন্ধ করা, বর্গাদারকে বর্গা রেকর্ড করে তার প্রাপ্য জমি ফিরিয়ে দেওয়া কিংবা আদিবাসীর হাত থেকে জমি চলে যাওয়া বন্ধ করা ইত্যাদি।

মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পগুলি আলোচনার সুবিধার্থে বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে-

১. মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক সংকট ও সমস্যা:

প্রচীনকাল থেকে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বর্ণাশ্রম প্রথা দেখা যায়। প্রত্যেক মানুষের কাছে পেশাগত এবং বিত্তগত অসাম্যর একটা পরিচয় থাকে। আর্য জাতির প্রচীনতম গ্রন্থ 'বেদ' থেকে আমরা এই ধারণার পরিচয় পাই। সেখানে সমাজে বিভিন্ন বৃত্তিতে নিয়োজিত মানুষদের বিভিন্ন বর্ণে বিন্যস্ত করা হয়েছে। আমরা জানি যজন, যাজন, অধ্যায়ন ও অধ্যাপনা ছিল ব্রাহ্মণদের বৃত্তি, দেশের জন্য যুদ্ধ ও রাজ্য শাসন করা ক্ষত্রিয়দের কাজ, বৈশ্যরা দেশের বাইরে এবং দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ করত, আর শূদ্ররা এই তিন বর্ণের মানুষদেরকে সেবা করত। এই বিভাজন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কও সমমর্যাদা সম্পন্ন ছিল না। যে সম্মান প্রথম তিন বর্ণের মানুষরা পেতেন, শূদ্ররা তা থেকে বঞ্চিত ছিল। আর্যরা আসার আগে ভারতীয় উপমহাদেশে শূদ্ররাই আদি অধিবাসী হিসেবে বসবাস করত। পরবর্তীকালে আর্যদের উন্নতমানের যুদ্ধ কৌশলের কাছে তারা হেরে গিয়েছিল। তাই তারা দেশের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে। এই সম্প্রদায়ের মানুষদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দুই দিক দুর্বল ছিল। এই দুর্বলতার কারণে, তারা চিরকাল সমাজের উচ্চবর্গের মানুষদের দ্বারা শোষিত, অবহেলিত এবং উপেক্ষিত হয়েছিল। একদিকে জাতিগত সমস্যা অন্যদিকে আর্থিক সংকটের দাপটে তাদেরকে দারিদ্র'র মুখে ঠেলে

দিয়েছিল। মহাশ্বেতা দেবীর 'সাঁঝ সকালের মা', 'এম.ডব্লু বনাম লখিন্দ', 'ঘণ্টা বাজে', 'ফারকাটি', 'কুড়ানির বেটা' ও 'নুন' প্রভৃতি ছোটগল্পগুলিতে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক সংকটের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। তিনি পরাধীন ভারবর্ষের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, জনজীবনের ভয়াবহ সংকট, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত (১৯৩৯-১৯৪৫) অর্থনৈতিক মন্দা তার প্রভাবে সাধারণ মানুষের কঙ্কালসারময় জীবনচিত্রকে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে দেশের জনজীবনের উপর হতাশা অবক্ষয় ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল।

২. মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে আদিবাসীদের ধর্মীয় জীবন:

আদিবাসীরা বেশির ভাগ প্রকৃতি পূজারী, প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। মহাশ্বেতা দেবীর বেশ কিছু ছোটগল্পে বিষয়ের কেন্দ্রে রয়েছে রাঢ় অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় জীবন ও ধর্মাচরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। কোনো কোনো ছোটগল্পে ধর্ম বিশ্বাসী আদিবাসীরা ধর্মকে বড় করে দেখেছে। আবার কোনো কোনো জায়গায় ধর্ম বিশ্বাসকে অতিক্রম করে গিয়ে বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের মাধ্যমে আদিবাসীরা ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এছাড়াও বেশ কিছু গল্পে রাঢ় অঞ্চলের আদিবাসী মানুষের বিচিত্র প্রকার ধর্মাচার গল্পের বিষয় হয়েছে।

'তারপর' ছোটগল্পে মেদিনীপুর জেলার লোধাশবর আদিবাসীদের সংস্কার, দেব-দেবী, পূজা-অর্চনা, উৎসব ও তাদের বিপর্যয়ের কাহিনির পরিচয় পাওয়া যায়। মেদিনীপুর জেলার চারপাড়িয়া গ্রামের কুরুরাজ দিগারের ছেলে সনাতন দিগার চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছিল। সনাতন দিগারের বাবা কুরুরাজের কথায় জানা যায়- তারা পূর্বে ছিল 'বনবাসী ব্যাধ' তাদের সর্দার কালকেতু ব্যাধ। মহাভারতে 'নিষাদ' শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'নিষাদ' এক অর্থে মৎস্যজীবী, আবার মাংস বিক্রেতাকেও 'নিষাদ' বলা হয়েছে। নিষাদের অপর নাম 'লুব্ধক' বা 'ব্যাধ'। 'শবর' জাতি বলতে চন্ডাল-ব্যাধ কিরাত ও নিষাদেরকে বোঝায়। লোধারা কালকেতু ব্যাধের গোত্রভুক্ত বলে দাবি করে। হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে অনার্য লোধাদের দেবদেবী 'অরণ্যচণ্ডী' বা 'বনদেবী'র মিল নেই। হিন্দুরাজার চণ্ডী পূজার দিন রাজার লোকেরা নীল গন্ধরাজ পায় না। কালকেতু ব্যাধ নীল গন্ধরাজ নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে উদ্যত, কিন্তু হিন্দু রাজার মন্দিরে ব্যাধজাতির প্রবেশ নিষিদ্ধ, এই অপরাধে রাজার পুরোহিত কালকেতুকে 'খড়মপিটা' করেছিল। গল্পে সমাজের উচ্চবর্ণের দাপটে লোধা শবরদেরকে ধর্মীয়ভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

৩. মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে আদিবাসীদের রাজনৈতিক চেতনা:

সমাজের অধিকাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। বাংলা ছোটগল্পে চিত্রিত রাঢ় অঞ্চলের অন্ত্যজ আদিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অনুসন্ধানে দেখা

যায়, আদিবাসীদের মধ্যে খুবই সীমিত সংখ্যক লোক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আছে। অধিকাংশ আদিবাসী রাজনীতির ঘেরাটোপ থেকে অনেকটা দূরে সরে থাকতে চায়। মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী', 'অপারেশন? বসাই টুডু' ও 'নুন' প্রভৃতি ছোটগল্পে আদিবাসীদের রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বাধীনতা পূর্ব যুগ থেকে বর্তমান সময়ের গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রতিনিয়ত আদিবাসী সম্প্রদায়কে নানানরকম রাজনৈতিক টানাপোড়েনের অংশীদার হতে হয়েছে। কখনো আদিবাসী সম্প্রদায় ইংরেজ বিরোধী বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ, মুণ্ডা বিদ্রোহ প্রভৃতি আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে নেতৃত্ব দিয়েছে। আবার কখনোও তারা জমি দখলের বামপন্থী আন্দোলনের শরিক হয়েছে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র করে যে সব ছোটগল্প রচিত হয়েছে, সেগুলি বিশ্লেষণ করে আদিবাসীদের রাজনৈতিক চেতনা সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া যায়।

লোকসংস্কৃতি বলতে কোন একজন ব্যক্তি বা মানুষের সংস্কৃতিকে বোঝায় না, একদল মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রাকে বোঝায়। একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডে বসবাসকারী মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনযাত্রার নানারকম ক্রমবিবর্তন এবং বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলে একধরনের বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, প্রথা-পদ্ধতি, নানারকম উৎসব অনুষ্ঠান পালন করে। এক কথায় বলতে গেলে, সংস্কৃতি হল ক্রমবিবর্তমান সভ্যতার উৎকর্ষের ফল। এ উৎকর্ষ কেবলমাত্র জীবনযাত্রার দিকটি প্রতিফলিত করে। সংস্কৃতি মূলত অনুশীলন নির্ভর তা বংশ পরম্পরায় বহমান। সভ্যতার আদিলগ্ন থেকে অর্থাৎ আদিম সমাজে মানুষ যখন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, প্রভৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল, প্রকৃতিতে যখন মাঠের ফসল পেকে উঠে কিংবা বসন্তে প্রখর সুর্যের আলোয় শাল, পিয়ালের পলাশ, বনজঙ্গলকে রাঙিয়ে তোলে অথবা হঠাৎ আকাশ থেকে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমে আসে এতে আদিম মানুষেরা কত-ই না আনন্দ পেত। এই আনন্দ বেশির ভাগ স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্যর মাধ্যমে প্রকাশ পেত। পরবর্তী পর্যায়ে আদিম বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে মানুষ নৃত্য করত। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিকে সন্তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে তারা নাচত। শিকার যাওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আদিম মানুষ উদ্দীপিত হওয়ার জন্য নাচত, বিভিন্ন পশুপক্ষীর গলার স্বরকে নকল করত। আর এভাবেই আদিম অধিবাসীর বংশধররা আজও শিকার সংস্কৃতিকে অখন্ডভাবে বজায় রেখেছে।

ছোটগল্পে আদিবাসীদের যে সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, তা বিশ্লেষণ করে জানা যায়, যে সাধারণ জীবন-জীবিকার আশ্রয় হিসেবে আদিবাসীগোষ্ঠী নানান ধরনের সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদেরকে জড়িয়ে নিয়েছে। জীবিকার বাহন হিসাবে আদিবাসীগোষ্ঠী সংস্কৃতির ধারক হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সংস্কৃতির মান অর্থের প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে শিল্পের সূক্ষ্মতায় উন্নীত হয়েছে। এখানেই আদিবাসীগোষ্ঠীর সংস্কৃতির স্বরূপটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়:
ভগীরথ মিশ্রের ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি

ভগীরথ মিশ্র (১৯৪৭) একেবারে চারের দশকের শেষের দিকে জঙ্গলমহলের(পশ্চিম মেদিনীপুর) একটি প্রত্যন্ত গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর শৈশবকাল গ্রামে কেটেছে সেই সময় গ্রামের মানুষদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে তাদের আদবকায়দা ও সংস্কৃতির সঙ্গে অনেকটা পরিচিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে দীর্ঘ সময় নগরবাসী হলেও তাদের প্রতি গভীরভাবে নাড়ীর টান অনুভব করেন, যা আজও সময়ে অসময়ে তাঁকে বিচলিত করে তোলে। সেই সব চরিত্রগুলো তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে ভিড় করেছে। ভগীরথ মিশ্র বিশ শতকের কথাসাহিত্যকদের মধ্যে এক ভিন্ন ধারার সাহিত্যিক। তিনি মূলত গ্রামীণ ধারার সাহিত্যিক, বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার তাঁর গল্পে উপন্যাসে এক ভিন্ন মাত্রা এনেছেন। এখানেই তিনি অন্যান্য সাহিত্যিকদের থেকে আলাদা হয়ে গেছেন।

ভারতের চিরবঞ্চিত, অবজ্ঞাত, অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষ বিশেষত দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ ও তাদের সমাজ, তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি প্রধানত সাঁওতাল, শবর, লোধা, খেড়িয়া, লোহার প্রভৃতি উপজাতি মানুষদের জীবনযাত্রা ও তাদের প্রতি শোষণ বঞ্চনার কথা তুলে ধরেছেন। এই সব আদিবাসীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার, পুলিশি সন্ত্রাস, নানারকম বৈষম্য বঞ্চনা প্রভৃতির বিরুদ্ধে তিনি লেখনী শক্তির মধ্যে দিয়ে নির্মম এক চাবুক মেরেছেন। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে নূন্যতম ভাত-জলের একান্তই প্রয়োজন, তাও যখন আদিবাসীরা পায় না তখন কি চরম দুর্দশায় না তাদেরকে ভুগতে হয় তা তিনি মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন।

ভগীরথ মিশ্র সত্তর দশকের সাহিত্যিক। তিনি তাঁর ছোটোগল্পের সীমিত সাধ্যর মধ্যেও সমসাময়িক সময় সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের বৈচিত্র্যকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। জীবনকে তিনি গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন বলে, তাঁর সাহিত্যে সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে অনেকটা ভিতর থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন। গল্পের বিষয় নির্বাচনে তিনি যেমন- রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার, রাষ্ট্রযন্ত্রের পীড়ন, আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির মনোজগতের নিখুঁত বিশ্লেষণ ও জমিদার শোষণকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন ঠিক তেমনই শাশ্বত সত্যকেও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির মূলে তাঁর সত্তর দশকের মার্কসীয় জীবন দর্শনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

'হুলমারার ভমরা মাঝি' ছোটগল্পে সাঁওতাল জনজীবনের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এই সামগ্রিক জীবন সংকটের বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করি। গল্পের কেন্দ্রীয়

চরিত্র 'ভমরা' মাঝি। ভমরা মাঝি হুলমারা গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। নিজস্ব সম্বল বলতে শুধুমাত্র বাস্তুভিটে ছাড়া কিছুই ছিল না। তাই সংসারের হাল টানতে গিয়ে তাকে প্রতি মুহূর্তে হোঁচট খেতে হয়েছিল। মাঝিকে কখনও বা সমাজের বাবু শ্রেণির মানুষদের কাছে হাত পাততে হয়েছে কিন্তু সব আশাই ব্যর্থ হয়েছে-

> ...চিকনবাবুরা সব চলে গেলেন যে যার ধান্দায়। শালা ভমরা মাঝি সারাদিনের ভুখা পেটটি লিয়ে বুড়া আঙুল চুষে চুষে ঘরে যা![৬]

'দৃষ্টি' নামক ছোটগল্পে কৈলাস শিকারী জাতিতে শবর, চোখে দেখতে পায় না, ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করে। প্রত্যেক দিন তাকে হাতিশোল গভীর জঙ্গলের পথ পেরিয়ে কোচডিহি, পলাশপাথর ও পঁচাপানি গ্রামগুলোতে ভিক্ষা করতে যেতে হয়। কৈলাস শিকারী অন্ধ হলেও পথ চিনতে তার অসুবিধা হয় না। একদিন কৈলাস শিকারী ভিক্ষা করে বাড়ি ফেরার পথে, বাউরি পাড়ার ছেলেরা তাকে ছিনতাই করার চেষ্টা করেছিল। সেদিন কৈলাস শিকারী জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে যাওয়া লৈতন লোহারের উপস্থিতিতে বেঁচে গিয়েছিল। লৈতন লোহার ঝড়েশ্বর লোহারের স্ত্রী, স্বামী অসুস্থতার কারণে কাজ করতে পারে না। লৈতনকে বনের কাঠ বিক্রি করে কোনরকমে অভাবের সংসার চালায়।

শেষ পর্যন্ত লৈতন কৈলাসের কথায় রাজী হয়নি। লৈতনও কৈলাসের মনের কথা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। কৈলাসের বাইরের চর্মচক্ষু অন্ধ হলেও, অন্তরের চোখ দিয়ে সে সংসারের সমস্ত কিছু দেখতে পায়। সে প্রতিনিয়ত নতুন সংসার গড়ার স্বপ্ন দেখে। গল্পটিতে আদিবাসী শবরদের দারিদ্রসুলভ সাংসারিক জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। 'লাবণের বয়স' নামক ছোটগল্পে লাবণ শিকারী জাতিতে শবর। লাবণ শিকারীর বয়স চল্লিশ আর স্ত্রী পারুলের বয়স সতেরো, তাদের দু'জনের মধ্যে বয়সের একটা বিশাল পার্থক্য রয়েছে। লাবণ শিকারী ও পারুল তুরকীর মেলায় যাওয়ার পথে দাগাশোলের শাল-মহুয়া জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ি সংকীর্ণ পথে তীব্র গতিতে গরুর গাড়ি ছুটিয়েছে। গরুর গাড়ির গাড়োয়ান লাবণ শিকারী মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে পারুলকে দেখে ভুবনভোলানো ভঙ্গিতে হাসছিল। গরুর গাড়িতে করে পারুলকে নিয়ে এক রোমান্টিক জীবনে পাড়ি দিতে চায়। মেলায় লাবণের আচরণে আধুনিকতার বিলাস বহুল জীবনযাত্রার ছোঁয়া নেই, একেবারে প্রান্তিক এলাকার খেটে খাওয়া মানুষের জীবনযাত্রা ফুটে উঠেছে। ভগীরথ মিশ্র একেবারে সাদামাটা গ্রাম্য জীবনের ছবিতে, প্রান্তিক মানুষের রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত তোবড়ানো মুখে আঞ্চলিক ভাষার প্রেম আখ্যানের এক নিপুণ তুলি এঁকেছেন। 'রাবণ' ছোটগল্পটি বাংলা সাহিত্যে এক অসাধারণ সৃষ্টি। গল্পে অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র রাবণ মাঝি জিজাবাই স্কুলে পড়ে। রাবণ মাঝি পড়াশুনায় খুব মেধাবী ছিল। কিন্তু এলাকার জমিদার সতীকান্ত সিংহ বাবুর স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচারে সর্বস্বান্ত হয়েছিল। পরবর্তীকালে রাবণ মাঝি একজন ধূর্ত-লম্পট, সুযোগসন্ধানী, অত্যাচারী শোষক সত্তায় পরিণত হয়। প্রহরাজের মৃত্যুর

সংবাদ দিয়ে গল্পটি শুরু হয়েছে। প্রহরাজ রাবণের গুড় পাহারাদারের কাজ করে। গতরাতে দুষ্কৃতির দল তাকে তেঁতুল গাছে বেঁধে সারা শরীরে খেজুর গুড় মাখিয়ে উলঙ্গ অবস্থায় রেখে দিয়েছিল। সেই রাতে প্রহরাজ বিষ পিঁপড়ের কামড়ে মারা যায়। প্রহরাজের মৃত্যুতে রাবণ একটুও বিচলিত হয়নি।

সরকার আইন প্রয়োগ করে জমিদারী প্রথা বিলোপ করেছে, কিন্তু সমাজে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষরা জমিদার কিংবা বুর্জোয়াদের শোষণের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক মতাদর্শে বিশ্বাসী বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও সরকারি প্রশাসনিক ব্যবস্থা সমাজের একেবারে নিচের স্তর পর্যন্ত পৌঁছায়নি। অনেক সময় রাজনৈতিক সংগঠন কিংবা সরকারি প্রশাসনিক কর্মকর্তারা স্বজন পোষণের খাতিরেই আইন কানুনগুলোকে বুড়ো আঙুল দেখায়। আইনের চোখে যে সবাই সমান অর্থের দম্ভে তারা একথা ভুলে যায়। আর এভাবেই প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে এক সতীকান্ত সিংহ ও হাজার রাবণ মাঝির জন্ম হয়।

সপ্তম অধ্যায়:
নলিনী বেরার ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি

নলিনী বেরা ১৯৫২ সালের ২০শে জুলাই অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার সুবর্ণরেখার নদীর তীরবর্তী সাঁওতাল, মুণ্ডা, লোধা, খেড়িয়া, শবর, ভুঁইয়া, ভূমিজ অধ্যুষিত জঙ্গলাকীর্ণ বাছুরখোঁয়াড় গ্রামের এক সাধারণ চাষি পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। কথাসাহিত্যিক নলিনী বেরার সাহিত্য জগৎ আলাদা। সে অঞ্চলের ভাষাও বাংলা নয়, হাফ বাংলা হাফ ওড়িয়া। সেই ভাষাতে নলিনী বেরা বাংলা সাহিত্যে নতুন প্রাণরস সঞ্চার করলেন। তাঁর সাহিত্যের জগৎ একটি নিদির্ষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনি যে এলাকাটি বেছে নিয়েছেন সেই এলাকার ভূ-প্রকৃতি, বন্ধুর-জমি, খাল, বিল, গাছপালা, লতা-পাতা, পশু-পাখি, ফুল-ফল প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদে যেমন পরিপূর্ণ ঠিক তেমনই অন্যদিকে সেই বনজঙ্গলকে কেন্দ্র করে একাধিক আদিবাসী সম্প্রদায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে আদিমতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। নলিনী বেরা তাঁর গল্প'র 'আমার কথা' অংশে বলেছেন-

> মুথা-ঘল্‌ঘসি-সরন্তি-শুশ্‌নি-ঘোড়াকানা-নাহাঙ্গা-বনপুই-বনকাল্লা-চ্যাঁকা-শাকপাল্‌হা ছিল। কাঁকড়ো- কুঁদরি-ভেলা-ভুড়কু-কেঁদ-কষা-আঁউলা-বাঁউলা-পান আলু-খামআলু-চুন-চুরকা-মেহা-মাদাল-ফলমূল ছিল। হা-ডুডু-দাঁড়িয়া-কাতি-একমদুকম-ওলডাঁটার বল বেঁধে ফুটবল খেলা ছিল।... রাত-ভিত চিড়ুকিন-গোমুহা-কালমুহী-কুচ্‌লা-সাতভউনি-ঝাঁপড়ি-বাউটিয়া ভূত ছিল।[৭]

তাঁর রচিত সাহিত্যের প্রায় সমগ্র অংশ জুড়ে রয়েছে সুবর্ণরেখা তীরবর্তী অঞ্চলের ভূমিপুত্রদের কথা, তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না'র কথা। অতি শৈশবকাল থেকে জন্মভূমির মাটির সঙ্গে তাঁর একটা নাড়ির সম্পর্ক ছিল। সেই মাটির ভিজে সোঁদা রুক্ষ গন্ধ, সেখানকার মানুষের সঙ্গে আশৈশব প্রাণের নিবিড়তা তাদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ, রাগ-অভিমান, ব্যথা-বেদনা, ঈর্ষা-দ্বেষ সব কিছু প্রতিনিয়ত তাঁর মনকে স্পর্শ করেছে। এই প্রত্যন্ত এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়রা বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ তথা ভারতবর্ষে বসবাস করেও, এদেশের সবরকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাই তাদেরকে প্রতিনিয়ত জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়। এইসব সাঁওতাল, মুণ্ডা, লোধা, খেড়িয়া, শবর, ভুঁইয়া, ভূমিজ প্রভৃতি আদিবাসী জনজাতির প্রতি মমত্ববোধ দ্বারা প্রতিনিয়ত তাড়িত হয়েছেন। তাই তার শিল্পী সত্তার সম্পৃক্তের মাধ্যমে বারবার তাদের কাছে ফিরে গেছেন। অতএব এক কথায় বলতে গেলে তিনি সুবর্ণরেখা তীরবর্তী রাঢ় অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। লোকায়ত ভূগোল, লোকায়ত লোক, লোকায়ত প্রতিবেশ, লোকায়ত ভাষা, লোকায়ত কথকতা, অজস্র লোকায়ত অর্থাৎ দেশজ শব্দের ব্যবহার, লোকায়ত উৎসব, লোকায়ত মেজাজ ব্যক্ত করেছেন। যা তাকে আলাদাভাবে আয়ত্ত করতে হয়নি, পরিশীলিতও করতে হয়নি। কখনও এই রীতিটি বড় প্রাচীন বলে মনে হয়, তবে নিঃসন্দেহে তার সঙ্গে মিশেছে আধুনিকতার শ্লেষ ও ব্যঙ্গোক্তি। এছাড়াও রয়েছে নিগূঢ় সাংকেতিকতা যা অবশ্য অনেক সময় রহস্যময়তায় ডুবিয়ে দিয়ে জ্ঞান নয়, আমাদের বোধের কাছে আবেদন করে। উত্তম পুরুষে ব্যক্ত লেখক নিজে সেখানকার একটি আস্ত চরিত্র যা গল্পকে আশ্চর্যজনকভাবে রসোত্তীর্ণ করে তোলেন। নিজস্ব সংস্কৃতি ছাড়া কোনো জাতির জীবন সম্পূর্ণ নয়। হোক না সে আদিবাসী জীবন অথবা উন্নত নাগরিক জীবন। আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনকে বাস্তব সম্মতভাবে তাঁর লেখায় তুলে ধরতে চেয়েছেন, তাই সঙ্গতভাবেই আদিবাসী সংস্কৃতি ছাড়া আদিবাসী জীবন একান্তভাবে অপূর্ণ। 'কুসুমতলা' গল্পে রাঢ় অঞ্চলের সাঁওতাল ও লোধা সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করে রচিত। গল্পে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে কুসুমফলের শাঁস খাওয়া এবং অবশেষে কুসুমফলের বীজ থেকে তেল বের করার পদ্ধতিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। মানব সভ্যতার আদিলগ্নে মানব গোষ্ঠীর বংশধররা এভাবেই তৈল শস্য কিংবা বিভিন্ন ফলের বীজ থেকে তেল বের করত। আলোচ্য গল্পে সাঁওতালরা কুসুমফলের বীজ থেকে তেল বের করে, যা এক তাদের আদিমতার পরিচয় বহন করে। 'ঝাঁটার কাঠি' গল্পের কথক লেখক নিজে। সুনি সাঁওতাল গল্পের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র, সুখজুড়ি কী ডাঙাসাহি'তে তার বাড়ি। দেহের গঠন খুবই সুন্দর এমনকি অজন্তা-ইলোরা-খাজুরাহোর গুহার দেওয়ালে অঙ্কিত ছবিও তার সঙ্গে তুলনায় অযোগ্য। গল্পের কথকের সঙ্গে

তার ঠাকুরদা বা আদরের দাদা সম্পর্ক রয়েছে। প্রতিবছর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে সুনির বাবা(ধনু কাকা) মা সবাই মিলে সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে কথকের বাড়িতে ধান মাড়াইয়ের কাজ করত। ধান মাড়াইয়ের পর অবশিষ্ট ধানকে পত্‌লি বলা হত। দড়িতে বাঁধা দলবদ্ধ গরুগুলোকে চালনা করতে বা থামাতে 'হে-ই হ্যা-ট্ হ্যা-ট্' 'হিঁ-ই-হ' করে সারারাত ধরে 'পতলি মাড়া' চলত। আর এই সুযোগে পরিশ্রমকে সামান্য পরিমাণে লাঘব করা, কিংবা কাজের একঘেঁয়েমি দূর করার জন্য এক-দু কলি গানও করত।

যৌথ কর্মের আন্তরিক প্রেরণা এবং হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তির দ্বারা কর্মসংগীতের সৃষ্টি হয়। কর্মসংগীত দু'টি লক্ষ্য সাধন করে। যৌথভাবে কাজ সম্পন্ন করার তাগিদ অপরটি কাজের একঘেঁয়েমি থেকে মুক্ত করে কাজের গতি বজায় রাখা। কৃষিকাজ, ছাদ-পিটাই ইত্যাদি কাজের সূত্রে কর্মসংগীতের সৃষ্টি হয়। আলোচ্য গল্পে সুনি সাঁওতালের মুখে এরকমই কর্মসংগীত শোনা যায়। 'দু'কান কাটা' গল্পটিতে ঝাড়গ্রাম তৎসংলগ্ন অঞ্চলের লোধা সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা ফুটে উঠেছে। সরকারি নানা প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের লোধাদের আর্থ-সামাজিক ও তাদের জীবন- জীবিকার পরিবর্তনের প্রয়াস ও প্রভাবের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। মূলত লোধদের গ্রামজীবনের উন্নয়ন ও জনসাধারণের সচেতনতার নানা সরকারি প্রকল্পের কথা উল্লেখিত। যেমন- সাক্ষরতা প্রকল্প, ঘরে ঘরে শৌচাগার প্রকল্প, জন্মনিয়ন্ত্রিত কর্মসূচি, টীকাকরণ কর্মসূচি, মদ্যপান দূরীকরণ, মুরগির পুলেসার রোগের অনুসন্ধান, গাভীর বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ, হ্যাচারি, বাবুইঘাসের দড়ি ও শালপাতার থালা তৈরি, ফুড প্রসেসিং, প্যাডি প্রসেসিং, প্রজাতি উন্নয়ন প্রকল্প তথা ছাগ প্রতিপালন প্রকল্প। গল্পে উল্লেখিত লোধারা অশিক্ষিত এবং দারিদ্র সীমায় বসবাস করে। তাই সরকারের পক্ষ থেকে ভর্তুকি দিয়ে পশু প্রদান করলেও তারা প্রতিপালন করতে পারে নি। লোধাদের ছোট ছোট ঘরে ছাগল প্রতিপালন করা সম্ভব নয়। গল্পটিতে লোধা সম্প্রদায় ও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

'রাঢ়' অঞ্চল বিশেষ করে পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম জেলা ও সুবর্ণরেখা নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী মানুষের প্রকৃতি, জীবনদর্শন, লোকবিশ্বাস, ভাষা সম্পর্কে নলিনী বেরার গভীর জীবনবোধ থেকে গল্পগুলিতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তাঁর বেশিরভাগ গল্পগুলিতে এইসব আঞ্চলিক উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তেমনই আঞ্চলিকতার আর একটি বিশেষ উপাদান হল লোকবিশ্বাস যা গল্পে পাওয়া যায়। নলিনী বেরা তাঁর গল্পে যখনই কোনো অঞ্চল বিশেষকে নিবিড়ভাবে ধরতে চেয়েছেন তখনই সেখানকার মানুষের লোকবিশ্বাসকে

সামনে থেকে দেখেছেন। অঞ্চল ভেদে আলাদা আলাদা লোকবিশ্বাস মানুষ ধারণ ও প্রতিপালন করে আসছে। এই লোকবিশ্বাসের মূলে তাদের শুভবোধ রয়েছে।

'চিড়কিন্‌ডাঙা' ছোটগল্পটির মূলে সাঁওতালদের অদ্ভুত এক লোকবিশ্বাস আছে। এই লোকবিশ্বাসের সঙ্গে রয়েছে রোমান্স। চিড়কিন্ শদটির অর্থ মেয়ে ভূত। সনাতন মুর্মু চিড়কিন্ ডাঙার গুণিন গুরা মুর্মু তার ছেলে পুন্নাডিহিতে মকাই- এর খেতে পাহারা দিতে গিয়ে চিড়কিন্ কে সাঙা করেছিল। আবার অন্য একগুণিনের পুত্র মানকাও বারিবদা না আমজুড়া থেকে ধরে এনেছে এক চিড়কিন্‌কে। শ্রীহরি দঁড়পাট ও চিড়কিন্ ধরে বাড়ির ঝি বানিয়ে রেখেছে। সাধারণ মানুষ থেকে চিড়ুকিন হওয়া এবং গুণিনের ক্রিয়াকলাপে অসীম শক্তি নিয়ে মানবসমাজে ফিরে আসা ও সংসার করার কথা গল্পে বিবৃত হয়েছে। 'চিড়কিন্‌ডাঙা' গল্পটিতে অদ্ভূত এক রোমান্টিক সত্তায় পাঠকের কাছে আরো বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছে। লেখক যাকে দীর্ঘদিন ধরে 'চিড়ুকিন ভূত' বলে মনে করেছেন, আজ সেই ভূতের মানবী সত্তাকে তাঁর চিন্তা চেতনায় স্থান করে নিয়েছে। তাই তিনি গুণিনের পরামর্শ অনুযায়ী 'চিড়ুকিন ভূত'কে যাচাই করার পথ থেকে বিরত থেকেছেন। 'চিড়ুকিন ভূত'কে মুহূর্তের মধ্যে হারাবার ভয়ে তিনি আর যাচাই করতে চাননি। গল্পে লোকবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়, যা রাঢ় অঞ্চলের আদিবাসীদের কাছে একান্তই বাস্তব বলে মনে হয়।

আদিবাসীদের আচার-বিশ্বাস-সংস্কার–প্রথার মাধ্যমে সামাজিক গঠন স্পষ্ট বোঝা যায়। সমাজের বিশ্বাস-সংস্কারের চিত্রণের মাধ্যমে সেই সম্প্রদায়ের মানস গঠনও সুস্পষ্টরূপে প্রস্ফুটিত হয়। আলোচ্য বাংলা ছোটগল্পে আদিবাসীদের বিশ্বাস-সংস্কার–প্রথার যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে অন্ধ বিশ্বাসের ভাগটা বেশি রয়েছে। অশিক্ষিত আদিবাসী মানুষরা যুক্তি-বুদ্ধির তোয়াক্কা করেনা, আধা ভৌতিক ও অলৌকিক বিশ্বাসে মগ্ন থাকে।

বর্তমানে যান্ত্রিক সভ্যতার অত্যাধুনিক জীবনযাত্রার কোলাহলকে দূরে সরিয়ে নলিনী বেরা আপন চেনা জগতকে নিয়ে গল্প রচনা করেছেন। গল্প পাঠের প্রতি মুহূর্তে পাঠক নতুন এক ভারতবর্ষের সন্ধান পায়। নলিনী বেরার জন্মভূমির পরতে পরতে যুক্ত হয়ে আছে আঞ্চলিক পালাপার্বণ, ভৌগোলিক ব্যপ্তি, মানুষদের জীবনাচণের সংলাপ যা ছোটগল্পের শাখায় শাখায় বিস্তৃত হয়ে ছোটগল্পকে বাংলা সাহিত্যে এক মহীরূহ আকার দান করেছে। আদিবাসীদের দারিদ্রময় জীবনের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে কল্পনার মায়াজাল। প্রকৃতির অতি তুচ্ছ বিষয়কে নিয়েও যে কত মোহময়ী হয়ে উঠা যায়। তিনি তা শিল্পী সত্তার মাধ্যমে দেখিয়েছেন। আমাদের বিশাল ভারতবর্ষে আদিবাসী মানুষজনদের মুখের ভাষাকে বাদ দিয়ে দেশের

কথনশৈলী পূর্ণ হয়না। নলিনী বেরা আদিবাসীদের সেই কথনশৈলীকে বেছে নিয়েছেন। তিনি কোনো বিক্ষোভ বা প্রতিবাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি। একটা বিরাট সাহিত্যের ক্যানভাসে গ্রামীণ জনজীবনকে চিত্রিত করেছেন। এখানেই তিনি অনন্য।

অষ্টম অধ্যায়:
পশ্চিম রাঢ়ের কয়েকজন আদিবাসী সাহিত্যিক

পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলে সাঁওতাল, কোল, কোড়া, মাহালি, মুণ্ডা, শবর, ভূমিজ, কর্মকার, কুম্ভকার, মাহাতো, বাউরি, বাগদি, হাড়ি, ডোম, মুচি, শুঁড়ি, করগা, ও খয়রা প্রভৃতি নানা জাতি, উপজাতি, বিভিন্ন শ্রেণির মানুষেরা বসবাস করে। এখানকার মানুষরা প্রকৃতিগতভাবে স্বভাব-সরল, সৎ ও পরিশ্রমী হয়। আবার সংস্কৃতিও তাদের নানা বৈচিত্র্য ভরা। জীবনযাপনের জন্য তাদেরকে সারা বছর ধরে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়। তবুও মানুষগুলি সবসময় হাসি মুখে থাকে। আবেগ- উল্লাসের স্বতঃস্ফূর্ততায় আকাশ-বাতাসকে মাতিয়ে তোলে। অরণ্য-প্রান্তরে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরগুলিতে, শিলাবতী-কংসাবতী-কুমারী-দ্বারকেশ্বর-তারাফেণী-ভৈরববাঁকী-দুয়ারসিনীর কিনারে কিনারে লোকসংগীতের করুণ সুর শোনা যায়। এছাড়াও উৎসব অনুষ্ঠানের আসরে ছড়া-গান-কথকতা-ধাঁধা-প্রবাদ-উপকথা প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির বহুবিচিত্র ধারা-উপধারা শোনা যায়। পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলের আদিবাসী সাহিত্যিকরা সেইসব লোকসংস্কৃতির অপার ভান্ডারকে তাদের রচনায় পাঠক সাধারণের কাছে তুলে ধরেছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬), রমাপদ চৌধুরী (১৯২২-২০১৮), মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬), ভগীরথ মিশ্র (১৯৪৭), তপন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৭) অনিল ঘড়াই (১৯৫৭-২০১৪), নলিনী বেরা (১৯৫২) প্রমুখ সাহিত্যিকদের লেখায় আদিবাসীদের সমাজজীবন ও তাদের সংগ্রামের কথা বারবার এসেছে। পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলে কয়েকজন আদিবাসী সাহিত্যিক আছেন। তারা বাংলা সাহিত্যিকদের মতো স্বনামখ্যাত নন। ক্ষেত্রসমীক্ষা কাজের সময় অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয়ও হয়েছিল। সাঁওতাল সাহিত্যিকরা তাদের রচনায় শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা, মূল্য বোধ কিংবা নীতিবোধ বিষয়গুলিকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন।

সাধুরাম চাঁদ মুর্মু(১৯০৮-১৯৫৫) পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শিলদা নিকটবর্তী কামারবাঁদি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় ইংরেজরা সাঁওতালদের উপর নানারকম অত্যাচার, শোষণ ও নির্যাতন চলত। তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, সমাজ ও ঐক্য একে একে সবই

ভেঙে পড়েছে। অন্যদিকে খেরওয়ালদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রচারও চলছিল। ১৯২৭ সালের এক ধর্মীয় জনসভায় খেরওয়ালদের উপর কয়েকটি বিধি নিষেধ আরোপ করেছিল- সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোল ও ভীল সম্প্রদায়ের মানুষেরা প্রত্যেকে 'রায়' পদবী ব্যবহার করবে। অমার্জিত পূজার্চনা এবং বিবাহ অনুষ্ঠানে তারা নৃত্য পরিবেশন করতে পারবে না। এছাড়াও বিভিন্নভাবে সাঁওতালদেরকে হেনস্তা করা হত। অন্যদিকে তাদের সমাজে মানুষেরা কুসংস্কার, অনাচারে জর্জরিত হয়ে বিপথে চালিত হচ্ছিল। মদ খেয়ে জমি ও পরিবারকে প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছিল। এরকম এক পরিবেশে তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে (১৯৩০, ১৪ জুন) পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ভীমপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষতার মধ্যে দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল। তিনি ভীমপুর সান্তাল হাই স্কুল এবং চব্বিশ পরগণার বিষ্ণুপুর শিক্ষা সংঘে কিছু দিন শিক্ষকতা করেছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কের অপর পরিচয় হল ঐতিহাসিক হিসেবে। ভারতীয় ইতিহাসে সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫)-এর দুই নায়ক সিদু মুর্মু ও কানহু মুর্মু'র বীরত্বের কাহিনি দীর্ঘকাল ধরে অজ্ঞাত ছিল। তিনি প্রথম তাঁর *সাঁওতাল গণ-সংগ্রামের ইতিহাস* গ্রন্থের মাধ্যমে সাঁওতাল বিদ্রোহের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত প্রবাদ, প্রবচন ও হেঁয়ালিকে সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

গোমস্তা প্রসাদ সরেন (১৯৪৩-২০২৩ জুন) পুরুলিয়া জেলার উদলবনি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষতার মধ্যে দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। শিক্ষক পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেওয়ার পর সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা করতে শুরু করেন। এই চর্চার অভিজ্ঞতা থেকে পরবর্তী সময়ে সাঁওতালি সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ জন্মায়। তিনি প্রথম *হড় সম্বাদ* পত্রিকায় লিখতে শুরু করেছিলেন। এছাড়াও *তেতরে, সিলি* ও অন্যান্য বহু পত্রিকায় তাঁর রচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। ষাট দশকে তাঁর ধারালো লেখনীর মাধ্যমে সাঁওতাল জাতির প্রতি শোষণ, শাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন। সাঁওতালি সাহিত্য বিকাশের পাশাপাশি তিনি সমাজ-সংস্কৃতি উন্নয়ন মূলক একাধিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

পুরুলিয়া জেলা বান্দোয়ান থানার কায়রা গ্রামে মহাদেব হাঁসদা (১৯৫০,২০ জুন) জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষতার মধ্যে দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ছোটবেলা থেকে সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে ওঠা, সহজাত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্যে চর্চার পথকে অনেকটা প্রশস্ত করেছিল। অন্যতম সাঁওতালি সাহিত্যের পথ প্রদর্শক সারদা প্রসাদ কিস্কুর অনুপ্রেরণায় তিনি প্রথম সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি পরে বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। মহাশ্বেতা দেবী, নিরঞ্জন হালদার, ড.

সুহৃদকুমার ভৌমিক ও ড. ডমন সাহু প্রমুখ ব্যক্তিদের কাছ থেকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ পেয়েছিলেন। তিনি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তাঁর ছোটগল্পে বিষয় করে সহজ সরলভাবে ব্যক্ত করেছেন। *হড় সম্বাদ, পছিমবাংলা, তেতরে, জিরিহিরি* ও *সিলি* প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়।

সারদা প্রসাদ কিস্কু পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা বেলপাহাড়ী থানার বাঁশপাহড়ী গ্রামে (খেরওয়াল বৌসয়ৌ) (১৯৫৯,) জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি কবিতা দিয়ে সাহিত্যচর্চা শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে গদ্যকে বেছে নিয়েছিলেন। সাঁওতাল জনজীবন থেকে গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন করে নিজের মননশীল ভাবনায় জারিত করে আধুনিকতায় প্রকাশ করেন। তিনি কাব্যে সৃষ্টির ক্ষেত্রে রোমান্টিক মনের পরিচয় দিলেও, গভীর সমাজ চেতনাও ফুটে উঠেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমসাময়িক সামাজিক প্রেক্ষাপটের বিচারে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

আদিবাসী সাঁওতালরা জগৎ সংসারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে তাদের সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধারণার উপর বেশি নির্ভরশীল হয়। তাদের বংশ পরম্পরায় শ্রুতিনির্ভর সংস্কৃতি থেকে প্রাপ্ত আখ্যান সমূহের পুনর্গঠন ও পুনর্ব্যাখ্যার মাধ্যমে এবং লিখিত আকারে প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তারা জীবন সংগ্রামের ক্রমবিবর্তনের বয়ানটি গড়ে তুলেছিল। খ্রিস্টান মিশনারি ও হিন্দুদের ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে তাঁরা এই প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। সাঁওতালি সাহিত্যের বিকাশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সমন্বয় গড়ে ওঠে। সাঁওতালি লেখকরা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের প্রতীক সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। গ্রামীণ জীবনযাত্রা থেকে তাঁরা গল্পের বিষয় সংগ্রহ করত। তাদের সম্প্রদায়গত অবস্থান ও সামাজিক বিন্যাস প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার নানা ঘটনার ওপর ভিত্তি করে তাঁরা গল্পের বিষয় প্রস্তুত করেছিলেন। গল্পে বিপ্লবীদের জীবনকে কেন্দ্র করে এক ভিন্ন ধরনের আখ্যান তৈরি করতে দেখা যায়।

উপসংহার:

আমার গবেষণার অভিসন্দর্ভ পত্র হল, 'নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশ্চিমরাঢ়ের আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি' শীর্ষক গবেষণা কাজে আমি যেমন সমৃদ্ধ হয়েছি তেমনি প্রভূত আনন্দ পেয়েছি। আমার গবেষণায় মূলত দুটি বিষয় সমান্তরালভাবে এসেছে, প্রথমত পশ্চিমরাঢ়ের ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে এই অঞ্চলের বসবাসকারী আদিবাসীদের সাধারণ পরিচয়, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব মিথ-বিশ্বাস-প্রথা-ট্যাবু প্রভৃতি সমন্বয়ে গড়ে ওঠা তাদের সামাজিক অবস্থান, সাংস্কৃতিক জীবন ও অর্থনৈতিক অবস্থা। আদিবাসীদের সমাজ, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের উপর নেমে আসা নানারকম অভিঘাত তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিংবা

আন্দোলন ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা এবং তাদের প্রতি অনাদিবাসী উচ্চবর্গের মানসিকতার পরিচয়। দ্বিতীয়ত ছোটগল্পগুলিতে একটা বিস্তৃত সময়পর্বে আদিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের দিকগুলি বাস্তবনিষ্ঠ নির্মাণের আলোচনা ও বিশ্লেষণ। বাংলা ছোটগল্পে বিস্তৃত ক্যানভাসে শুধু উপেক্ষিত আদিবাসীদের গোষ্ঠীজীবন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও পালা-পার্বণকে তুলে ধরা হয়নি, একই সঙ্গে তাদের উপর দীর্ঘদিনের আর্থিক শোষণ ও নির্যাতনকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত বিষয়গুলো গবেষণায় উপস্থাপিত হয়েছে। চর্যাপদ কিংবা মধ্যযুগের সময় থেকেই কমবেশি আদিবাসীদের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে ভারতে ইংরেজ শাসনকালে প্রথম আদিবাসী চিহ্নিতকরণের ও স্বরূপ সন্ধানের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ ছাড়াও সমাজতাত্ত্বিকদের দ্বারা চিহ্নিত নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যর ভিত্তিতে আদিবাসীদের স্বরূপ ও সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে। আদিবাসীদের সংজ্ঞা নির্ধারণ বা সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যর নিরিখে চিহ্নিতকরণ খুবই কঠিন কাজ ছিল। আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস প্রভৃতি নির্দিষ্ট কিছু লক্ষণকে সামনে রেখে তাদের একটা তালিকা তৈরি করা হয়েছে। তাদের এই তালিকা আদমশুমারি জনগণনা অনুযায়ী পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়। যেমন- ২০১১ সালের আদমশুমারি জনগণনাতে রাষ্ট্র ৭০৫টি জনগোষ্ঠীর আদিবাসীকে তপশিলি উপজাতির স্বীকৃতি দিয়েছে। আদিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপর ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল। ইংরেজ শাসনকালে তাদের আর্থ-সামাজিকতার স্বনির্ভরশীলতা নষ্ট হয়েছিল। গবেষণা আলোচনায় ব্রিটিশ সরকারের প্রবর্তিত আইন প্রয়োগের ফলে আদিবাসীদের জঙ্গলে জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন- আদিবাসীদের উপর 'ক্রিমিনাল ট্রাইবস্ অ্যাক্ট' আইন উঠে যাওয়ার পরেও লোধা ও শবররা সামাজিক ঘৃণা, অপবাদ থেকে মুক্তি পায় নি। আলোচ্য ছোটগল্পগুলিতে সেই সব ঘৃণার বা অপবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। গবেষণাকর্মে নির্বাচিত গল্পকাররা হলেন- শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, ভগীরথ মিশ্র, নলিনী বেরা ও পশ্চিমরাঢ়ের কয়েকজন আদিবাসী সাঁওতাল ছোটগল্পকার, সেই সময়ের জটিল আবর্তের মধ্যে থেকেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা মানবতার জয়গান শুনিয়েছেন। নগরকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার বিপরীতে পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের পটভূমিতে গল্পকাররা নিজেদের শিল্পোৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন। আলোচ্য গল্পের বিষয় বিশ্লেষণ ও পশ্চিমরাঢ়ের কয়েকজন আদিবাসী সাঁওতাল সাহিত্যিকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারে জেনেছি এই অঞ্চলের মানুষগুলির উপর অনাচার, নানা অসংগতি, শাসন ব্যবস্থায় জুলুম, অন্যায়-অত্যাচার, বেঁচে থাকার নানা সমস্যা, জীবন সংকট, মূল্যবোধের দোটানা ও প্রতিবাদী সত্তার বিকাশ, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার, সমাজ-

বন্ধনহীন যৌন জীবন, চিরকালীন প্রথা, আচার-আচরণ, সামাজ ও সাংস্কৃতির অবক্ষয়ের প্রত্যক্ষ ছবি প্রভৃতি বিচিত্র প্রসঙ্গ। আর এইসব কথাশিল্পীদের কলমে তা মূর্ত হয়েছে। নৃতাত্ত্বিক বা ভাষাতাত্ত্বিক গোত্রের মধ্যে জনগোষ্ঠীর সামাজ ও সংস্কৃতির পার্থক্যর পারস্পরিক দ্বন্দ্বের বাস্তবতাকে দেখিয়েছেন। আদিবাসীদের মধ্যে গোষ্ঠী লড়াই একান্ত বাস্তব। আদিবাসীদের কৌম জীবন ভাঙনের পিছনে, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের উপর নিরন্তর আঘাতকে দায়ী করা যায়। ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে পরবর্তী সময় পর্যন্ত তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের উপর বারবার আঘাত এসেছে। এতে তাদের অরণ্য নির্ভর গ্রাম্য জীবন পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। এই সামাজিক অভিঘাতগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, একটা সভ্যতা অন্য সভ্যতাকে গ্রাস করেছে। যেমন- কৃষিসভ্যতা অরণ্যকে গ্রাস করেছে। আবার কয়লা খনির আবিষ্কার, নদীতে বাঁধ নির্মাণ ও নগরায়ণে কৃষিজমিকে নষ্ট করেছে। এরফলে অরণ্য নির্ভর ও কৃষিনির্ভর আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে নানারকম সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। তাই তারা আড়কাঠিরদের হাত ধরে জীবিকা নির্বাহের তাগিদে কয়লাখনির শ্রমিক, চা বাগানের শ্রমিক কিংবা রেল লাইনের শ্রমিক হয়ে ভিন্ রাজ্যে পাড়ি দিয়েছে। যখন কয়লাখনি ও চা বাগান বন্ধ হয় তখন তারা চরম অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়েছে। এই আর্থিক সংকট থেকে মুক্তি পেতে অনেকে তারা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। আলোচ্য ছোটগল্প বিশ্লেষণের সময় এ প্রসঙ্গগুলো বারবার এসেছে। লেখকরা সামাজিক দায়বদ্ধতায় সাহিত্যে কর্মের পাতায় পাতায় পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের আদিবাসীদের সামাজিক নানা সমস্যার সঙ্গে প্রতিবাদ ও প্রতিকারের বার্তা ঘোষণা করেছে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলটির ইতিহাসের সঙ্গে সমাজজীবনের নানা প্রসঙ্গ আলোচিত ও আলোকিত হয়েছে। একই সঙ্গে গণজাগরণের রহস্য অনুসন্ধানকারী প্রকৃত উদ্দেশ্য হিসেবে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচিত হয়েছে। যা আমার গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। গবেষণায় পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের আদিবাসীদের গোষ্ঠীজীবন, সংস্কৃতির স্বরূপ ধরার প্রয়াস থাকলেও হয়তো অনেক কিছুই বাকি থেকে গেল। অন্য কোন গবেষক অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে অনালোকিত দিকগুলি আলোকপাত করবেন। এখানেই শেষ নয়, বহমান ধারায় এ ধরনের আরো অনেক ছোটগল্প ক্রমেই সংযোজিত হতে চলেছে। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে দ্রুত অর্থনৈতিক পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি আদিবাসী জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। এরফলে গল্পকারদের কলমে প্রতিনিয়ত আরো নানাদিক উন্মোচিত হবে। এতে আরো নতুন করে ভবিষ্যতে গবেষণার সুযোগ থাকল। আমার এই গবেষণা কাজটি ভবিষ্যতে পাঠকে কৌতূহলী ও আগ্রহী করে নানান প্রশ্নের সমাধানের সূত্র দিয়ে সন্দেহ নিরসন করবে এই প্রত্যাশা রাখি।

তথ্যসূত্র:

১. রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, আশ্বিন, ১৪০২, পৃষ্ঠা- ১১৯-১২০।

২. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র* (৩য় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি., কলকাতা, ১৪২৪, পৃষ্ঠা-২৫১।

৩.বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'কালচিতি', *গল্প সমগ্র* (২য় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, দশম মুদ্রণ, চৈত্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৫৮০।

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'হে অরণ্য কথা কও', *বিভূতি রচনাবলী* (ষষ্ঠ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১ম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৫৮৩।

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *তারাশঙ্করের গল্পগুছ* (১ম খন্ড), সাহিত্য সংসদ, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, মে ২০১৭, ভূমিকা, পৃষ্ঠা- তেষটি।

৬. মিশ্র, ভগীরথ, *সেরা ৫০টি গল্প,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, ২০১০, পৃষ্ঠা-৭৬।

৭. বেরা, নলিনী, *শ্রেষ্ঠ গল্প,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, বইমেলা ২০০৩, পৃষ্ঠা- Xvii.

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ:

১. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী গল্পসমগ্র* (১ম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ২০১৪।

২. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী গল্পসমগ্র* (২য় খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মে, ২০১৫।

৩. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী গল্পসমগ্র* (৩য় খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১৪।

৪. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* (৭ম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন, ২০১৫।

৫. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* (৮ম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট, ২০১৬।

৬. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* (১০ম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১৫।

৭. ভট্টাচার্য, জগদীশ(সম্পাদিত), *'তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ* (১ম খন্ড), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ মে, ২০১৭।

৮. ভট্টাচার্য, জগদীশ(সম্পাদিত), *'তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ* (২য় খন্ড), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, চতুর্দশ মুদ্রণ, আগস্ট, ২০১৭।

৯. ভট্টাচার্য, জগদীশ(সম্পাদিত), *'তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ* (৩য় খন্ড), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ২০১৬।

১০. বেরা, নলিনী, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল, ২০১৫।

১১. রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চদশ সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫।

১২. *বঙ্কিম রচনাবলী* ২ (প্রবন্ধ), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ডিসেম্বর, ২০০৯।

১৩. মিশ্র, ভগীরথ, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১০।

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা, মিত্র, গজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *বিভূতি রচনাবলী* (৭ম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১ম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৪।

১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা, মিত্র, গজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *বিভূতি রচনাবলী* (৮ম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১ম প্রকাশ, পৌষ, ১৪০৪।

১৬. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র* (১ম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ২য় মুদ্রণ মাঘ, ১৪২৪।

১৭. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র* (২য় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ২য় মুদ্রণ বৈশাখ, ১৪২৩।

১৮. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র* (৩য় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ২য় মুদ্রণ অগ্রহায়ণ, ১৪২৪।

১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীতারাদাস ও অন্যান্যরা, *গল্প সমগ্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়* (১ম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ, কার্তিক, ১৪২৩।

২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীতারাদাস ও অন্যান্যরা, *গল্প সমগ্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়* (২য় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, দশম মুদ্রণ, চৈত্র, ১৪২২।

সহায়ক গ্রন্থ

১. সুর, অতুল, *বাঙলা ও বাঙালীর সমাজ সংস্কৃতি,* জ্যোৎস্নালোক, ১৯৯১।

২. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, *কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের একশ' বিশ বছর,* দে'জ পাবলিশিং ২০১৬, কলকাতা।

৩. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, *বাংলা কথাসাহিত্য-জিজ্ঞাসা,* দে'জ পাবলিশিং, ২য় সংস্করণ, ২০১৬ ,কলকাতা।

৪. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোং, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৫।

৫. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলার লোকসাহিত্যে প্রথম খন্ড আলোচনা,* ক্যালকাটা বুক হাউস, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬২।

৬. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার(সম্পাদিত), *পঞ্চাশের দশকের কথাকার,* পুস্তক বিপণি, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৮।

৭. দাশ, উদয়চাঁদ,*আখ্যানের সম্প্রসারণ : উনিশ শতক বিশ শতক,* বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।

৮. চৌধুরী, কমল, *ডাইনি,* দে'জ পাবলশিং, কলকাতা, ২০০৩।

৯. সেন, ক্ষিতিমোহন, *জাতিভেদ,* গবেষণা ও অন্যান্য প্রকাশন, বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন, ১৯৯৭।

১০. রায় চৌধুরী, গোপিকানাথ, *দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য,* দে'জ পাবলশিং, কলকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩৮০।

১১. ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যায় পার্থ(সম্পাদিত), *নিম্নবর্গের ইতিহাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৯।

১২. সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী, *মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৫।

১৩. মণ্ডল, চিত্ত ও রায়মণ্ডল, প্রথমা(সম্পাদিত), *বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত,* অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৪।

১৪. ঘোষাল, ছন্দা, *আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য : সমালোচনা ও শৈলী,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ।

১৫. মুখোপাধ্যায়, জগমোহন, *গবেষণা-পত্র অনুসন্ধান ও রচনা,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট, ২০০৬।

১৬. সিংহরায়, জীবেন্দ্র, *কল্লোলের কাল,* দে'জ পাবলশিং, কলকাতা, ২০১৮।

১৭. নায়ক, জীবেশ, *লোকসংস্কৃতিবিদ্যা ও লোকসাহিত্য,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ২০১০।

১৮. রায়, জ্যোতিপ্রসাদ, *রাঢ়ের গল্পবিশ্ব ও তারাশংকর,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৮।

১৯. ভট্টাচার্য, তপোধীর, *আখ্যানের বহুস্বর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৫।

২০. ভট্টাচার্য, তপোধীর, *ছোটগল্পের প্রতিবেদন,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১১।

২১. ঘোষ, তপোব্রত, *রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ,* দে'জ পাবলিশিং, ৭ম সংস্করণ, কলকাতা, ২০১৮।

২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *আমার সাহিত্য-জীবন,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০২০।

২৩. সেন, দীনেশচন্দ্র, *বৃহৎ বঙ্গ,*(২য় খন্ড), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩৪২।
২৪. ঘোষ, দীপঙ্কর, *আদিবাসী শিকার সংস্কৃতি,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ২০০৯।
২৫. রায়, দেবেশ,(সম্পাদিত), *দলিত,* সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৫।
২৬. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ* (১ম খন্ড), সুবর্ণরেখা, ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৩।
২৭. আচার্য, নন্দদুলাল, *রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি,* পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ১ম সংস্করণ কলকাতা, ২০০৩।
২৮. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *সাহিত্যে ছোটগল্প,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ৩য় সংস্করণ, কলকাতা, বঙ্গাব্দ ১৪১২।
২৯. রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব),* দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চদশ সংস্করণ, কলকাতা, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ।
৩০. হেমব্রম, পরিমল, *সাঁওতালি সাহিত্যের ইতিহাস,* নির্মল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ৫ম মুদ্রণ, ২০১৭।
৩১. বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল, *ভূমি ও ভূমিসংস্কার সেকাল একাল,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মূদ্রণ মার্চ, ২০১৭।
৩২. সেনগুপ্ত, পল্লব, *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ,* পুস্তক বিপণি, ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ২০০২।
৩৩. ঘোষ, প্রদ্যোত, *বাংলার জনজাতি* (১ম খন্ড), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৭।
৩৪. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস,* পুস্তক বিপণি, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৯।
৩৫. ঘোষ, বিজিত, *বাংলা ছোটগল্পে প্রতিবাদী চেতনা,* পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০০।
৩৬. চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর, *গৌড়বঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতি,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৭।
৩৭. চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার,* মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৮৯।
৩৮. দেবী, মহাশ্বেতা, (সম্পাদিত),*শবর লোকগান ও লোককথা,* সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৯।
৩৯. মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র, *গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৯।
৪০. চৌধুরী কামিল্যা, মিহির, *রাঢ়ের গ্রামদেবতা,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯০।

৪১. শ, রামেশ্বর, *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা,* পুস্তক বিপণি, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ।

৪২. চট্টোপাধ্যায়, শিবপ্রসাদ, *লোকায়ত পশ্চিমরাঢ়,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ২০০৭।

৪৩. দাশ, শিশিরকুমার, *বাংলা ছোটগল্প,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬।

৪৪. সেন, শুচিব্রত, *'পূর্বভারতে আদিবাসী অস্তিত্বের সংকট,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩।

৪৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *বঙ্গসাহিত্য উপন্যাসের ধারা,* মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি., কলকাতা, ২০১৮-২০১৯।

৪৬. গিরি, সত্যবতী ও মজুমদার ড. সমরেশ(সম্পাদিত) *প্রবন্ধ সঞ্চয়ন* (১ম, ২য় খন্ড), রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১৩।

৪৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরিৎ, *তারাশঙ্কর ও সমকালীন সাহিত্য সমাজ,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৪০৫।

৪৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর,* দে'জ পাবলিশিং, ২০২১।

৪৯. চক্রবর্তী, সাবিত্রী নন্দ, *আধুনিক বাংলা ছোটগল্প মূল্যবোধের সংকট* (১ম খন্ড), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৯।

৫০. সেন, সুজিত(সম্পাদিত), *জাতিপাত ও জাতি: ভারতীয় প্রেক্ষাপট,* নবপত্র প্রকাশন, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৩।

৫১. সামন্ত, সুবল(সম্পাদিত), *বাংলা গল্প ও গল্পকার* (১ম খন্ড), এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ১৯৯৫।

৫২. সামন্ত, সুবল(সম্পাদিত), *বাংলা গল্প ও গল্পকার* (২য় খন্ড), এবং মুশায়েরা, কলকাতা।

৫৩. সামন্ত, সুবল(সম্পাদিত), *বাংলা গল্প ও গল্পকার* (৩য় খন্ড), এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৯।

৫৪. সামন্ত, সুবল(সম্পাদিত), *বাংলা গল্প ও গল্পকার* (৪র্থ খন্ড), এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০১।

৫৫. সামন্ত, সুবল(সম্পাদিত), *বাংলা গল্প ও গল্পকার* (৫ম খন্ড), এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৩।

৫৬. ঘোষ, সুবোধ, *ভারতের আদিবাসী,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রা. লি., ৪র্থ সংস্করণ, কলকাতা, ২০০০।

৫৭. চক্রবর্তী, সুমিতা, *ছোটগল্পের বিষয়-আশয়,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৪।

৫৮. মিদ্দে, সুরঞ্জন(সম্পাদিত), *সাঁওতাল ও মিশনারি,* নান্দনিক, কলকাতা, ২০১৮।

৫৯. হোসেন, সোহারাব, *বাংলা ছোটগল্পে ব্রাত্যজীবন,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৮।
৬০. ভট্টাচার্য, সৌরীন(অনুবাদ), *মানব অধিকার প্রশ্ন ও উত্তর* (লিয়া লেভিন) ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, ২০১৬।
৬১. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, বঙ্গীয় শব্দকোষ(১ম,২য় খন্ড) সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৬।
৬২. Kosambi, D.D. *Myth and Reality,* Studies In the Formation of Indian Culture, First Printed 1962.

বাংলা পত্র-পত্রিকাপঞ্জি;

১. *অশোকনগর* (বিভূতিভূষণ সংখ্যা), অভিষেক চক্রবর্তী, রুদ্রদীপ চন্দ (সম্পাদক), ৫০৮/৮, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা-৭৪৩২২২, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, বইমেলা ১৪২১।
২. *আত্মবিকাশ* (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা), শিবেন্দু শেখর চক্রবর্তী (সম্পাদক), ১নং পল্লীশ্রী কলোনী, ই.পি-৬৫, কলকাতা-৭০০০৪৮, অষ্টম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, অক্টোবর'১৬-ডিসেম্বর'১৬।
৩. *আত্মবিকাশ* (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা), শিবেন্দু শেখর চক্রবর্তী (সম্পাদক), ১নং পল্লীশ্রী কলোনী, ই.পি-৬৫, কলকাতা-৭০০০৪৮, ত্রয়োদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর'১৮-ফ্রেব্রুয়ারি'১৯।
৪. *এবং মুশায়েরা* (গল্প ও গল্পকার বিশেষ সংখ্যা) সুবল সামন্ত (সম্পাদক), নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা, ষষ্ঠ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৯৯।
৫. *গল্প সরণি* (মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা), অমর দে (সম্পাদক), হোলি অ্যাপার্টমেন্ট, তৃতীয় তল, ৪ যশোর রোড, দমদম, কলকাতা-৭০০০২৮, ষোড়শ বর্ষ: বার্ষিক সংকলন, ১৪১৮।
৬. *বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা,* মিহির চৌধুরী কামিল্যা (সম্পাদক), পাবলিকেশন ইউনিট বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, নবম সংকলন, ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৯৫।
৭. *বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা,* শেখর সমাদ্দার (সম্পাদক), বাংলা বিভাগ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০০৩২, ২২তম সংখ্যা, অক্টবর, ২০১৮।
৮. *বারণরেখা* (আদিবাসী/লোকসংস্কৃতি ভারতের ভিতর ও বাহির), অরূপ বসু, প্রফুল্লকুমার দে (সম্পাদক), ১২/২, সরশুনা মেইন রোড কলকাতা- ৭০০০৬১, ষষ্ঠ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ২০১৭।
৯. *শুভশ্রী* (ছোটগল্পকার: স্মরণে বিস্মরণে সংখ্যা), শান্তনু সরকার (সম্পাদক), বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ৫০ বর্ষ ২০১১-২০১২।
১০. *সমকালের জিয়ন কাঠি* (মাহাশ্বেতাদেবী বিশেষ সংখ্যা), নাজিবুল ইসলাম মন্ডল (সম্পাদক), সমকালের জিয়ন কাঠি প্রকাশন, জীবন মন্ডল হাট, মায়াহাউড়ি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, যুগ্ম সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন সংখ্যা, ২০১৫।

১১. *সৃজন* (বিষয়: নলিনী বেরা বিশেষ সংখ্যা), লক্ষ্মণ কর্মকার (সম্পাদক) ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, vol. 27: November 2019.

ইংরেজি পত্র-পত্রিকাপঞ্জি;

Gazetteers and Journal;

1. 'A Bankura Village; Some Aspects of Socio-Caltural life', *West Bengal District Gazetteers, Bankura,* Edited by A.K Banerjee, Calcutta, 1968.
2. *Bengal District Gazetteers, Birbhum*: complied by L. S. S. O'mally, Govt of W.B, Calcutta, 1st Re-print: Oct, 1996.

বৈদ্যুতিন তথ্যসূত্র:

১. https://en.wikipedia.org/wiki/Rarh_region. 5.4.2023, 7.16 P.M

২. https://en.wikipedia.org/wiki/Rarh_region#History. 5.4.2023, 7.30

৩. https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Aryan_migrations. 6.4.2023, 9.50 P.M

৪. https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Indo-Aryan_languages. 7.4.2023, 8.30 A.M

৫. https://en.wikipedia.org/wiki/Sabar_people. 7.4.2023, 8.35 A.M

৬. https://en.wikipedia.org/wiki/Criminal_Tribes_Act. 7.4.2023, 9.45 A.M

তত্ত্বাবধায়ক গবেষক